
অদৃশ্য
মানুষ

সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিশু-সাহিত্যিক

হেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রণীত

অদৃশ্য মানুষ

—লেখকের জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা—

একাধারে রহস্য-রোমাঞ্চ, ভয় ও উৎকণ্ঠা! লেখনীর সাবলীল গতি ও ভাবধারা মনে করিয়ে দেয় সেই পুরানো দিনের ইংরাজী গ্রন্থখানিকে 'The Invisible Man.

ছোটদের মন-মাতানো এ গ্রন্থ মনোরম রঙিন প্রচ্ছদ ও সুন্দর সাজ-পোশাকে সমৃদ্ধ হয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করল!

পরিবেশক

এন. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং

১৩, কলেজ রো,

কলি-৯

প্রকাশক
সৌমেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়
১৩, কলেজ রো
কলিকাতা—৯

মুদ্রক
শ্রীনিমাইকুমার ঘোষ
দি ভোলানাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা — ৬

বার টাকা মাত্র

বাংলার ছেলেমেয়েদেরকে, শর্মিলা-প্রকাশনীর সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য

তোমরা জানবে ঃ

* সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিক

হেমেন্দ্রকুমার রায়

তোমরা মনে রাখবে ঃ

*সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রহস্য-কাহিনী

'অদৃশ্য মানুষ'

তোমরা পড়বে ঃ

* সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এই ভয়াল-ভয়ঙ্কর উপন্যাসে অদৃশ্য ঘুষি···অদৃশ্য লাথি···আর, অদৃশ্য চুরি !···শূন্যে উড়ে চলেছে লোহার গরাদ, ভেসে বেড়াচ্ছে পিস্তল ! ছুটন্ত মানুষ, তার পিছনে শূন্যপথে উড়ন্ত রিভলবার ! এ ছাড়াও আছে, টেবিল-চেয়ারের নৃত্য, প্রজাপতির মতো উড়ন্ত নোটের বাণ্ডিল এবং আরো বিস্ময়কর অনেক কিছু···



অদৃশ্য মানুষ

অপরিচিত আগন্তুকের আগমন ॥ এক

একটি ছোটখাটো শহর। তার আসল নামটি বলব না। ধরে নাও, তার নাম হচ্ছে শ্রীপুর। ছুটির সময়ে নানান দেশ থেকে সেখানে অনেক লোক বেড়াতে আসে। কারণ, জায়গাটির জলহাওয়া নাকি ভালো।

পাহাড়ে-শহর। পথে-ঘাটে বেরুলেই আশেপাশে ছোট-বড় পাহাড় দেখা যায়। পাহাড়ে-শহরে তখন পাহাড়ে-শীত। মাঝে মাঝে বরফও পড়ে।

বৈকাল। শ্রীপুর শহরে যখন রেলগাড়ি এসে থামল, চারিদিকে তখন কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। সে-হাওয়া যেন গায়ে ছুরির ফলার মতন বিঁধে যায়। বোধহয় বরফ পড়তে আর দেরি নেই।

একজন যাত্রী ইস্টিশানে এসে নামল। যাত্রীটি জাতে বাঙালী, সেটা তার পরনের কাপড় দেখলেই বোঝা যায়। তার পায়ে ঘোড়তোলা জুতো ও ফুল-মোজা। গায়ের জামা দেখবার জো নেই, কারণ একখানি আলোয়ানে সে গা ঢাকা দিয়েছিল। কেবল তার ডান হাতের খানিকটা দেখা যাচ্ছিল, সেই হাতে ঝুলছিল একটা পোর্টম্যাণ্টো। তার হাতটি ছিল দস্তানা-পরা। আলোয়ানের উপর জেগে আছে তার অদ্ভুত মুখখানা—সে-মুখের সবটাই ব্যাণ্ডেজে একেবারে ঢাকা। সাদা ব্যাণ্ডেজের ভিতর থেকে জেগে আছে কেবল তার গোঁফদাড়ি আর নাকের ডগাটা। ঠুলি-চশমা, অর্থাৎ 'গগ্‌ল্‌স্' দিয়ে সে তার চোখ দুটো পর্যন্ত সকলকার চোখের আড়াল করে রেখেছে। এই রহস্যময় লোকটি যে কে তা আমরা জানি না, এবং যতদিন না তার নাম জানতে পারি ততদিন পর্যন্ত তাকে আমরা যাত্রী বলেই ডাকব।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে ইস্টিশানের বাইরে এসে যাত্রী একটা পথ ধরে এগিয়ে চলল। খানিক দূর অগ্রসর হয়েই একখানা দোতলা বাড়ির সামনে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাড়িখানার দোতলার বারান্দায় একখানি সাইনবোর্ডে বড়-বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'শ্রীপুর স্বাস্থ্যনিবাস'। অল্পক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে যাত্রী বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল।

এই স্বাস্থ্যনিবাসটির এক[illegible] পরিচয় দেওয়া দরকার। শ্রীপুরে [illegible]ড়া[illegible]ন, [illegible]কই এই স্বাস্থ্যনিবাসে আশ্রয়



একজন যাত্রী এসে ইস্টিশনে নামল। পৃষ্ঠা ৬

পাহাড়ে-শহর। পথে-ঘাটে বেরুলেই আশেপাশে ছোট-বড় পাহাড় দেখা যায়। পাহাড়ে-শহরে তখন পাহাড়ে-শীত। মাঝে মাঝে বরফও পড়ে।

বৈকাল। শ্রীপুর শহরে যখন রেলগাড়ি এসে থামল, চারিদিকে তখন কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। সে-হাওয়া যেন গায়ে ছুরির ফলার মতন বিঁধে যায়। বোধহয় বরফ পড়তে আর দেরি নেই।

একজন যাত্রী ইস্টিশানে এসে নামল। যাত্রীটি জাতে বাঙালী, সেটা তার পরনের কাপড় দেখলেই বোঝা যায়। তার পায়ে ঘোড়তোলা জুতো ও ফুল-মোজা। গায়ের জামা দেখবার জো নেই, কারণ একখানি আলোয়ানে সে গা ঢাকা দিয়েছিল। কেবল তার ডান হাতের খানিকটা দেখা যাচ্ছিল, সেই হাতে ঝুলছিল একটা পোর্টম্যাণ্টো। তার হাতটি ছিল দস্তানা-পরা। আলোয়ানের উপর জেগে আছে তার অদ্ভুত মুখখানা—সে-মুখের সবটাই ব্যাণ্ডেজে একেবারে ঢাকা। সাদা ব্যাণ্ডেজের ভিতর থেকে জেগে আছে কেবল তার গোঁফদাড়ি আর নাকের ডগাটা। ঠুলি-চশমা, অর্থাৎ 'গগ্‌ল্‌স' দিয়ে সে তার চোখ দুটো পর্যন্ত সকলকার চোখের আড়াল করে রেখেছে। এই রহস্যময় লোকটি যে কে তা আমরা জানি না, এবং যতদিন না তার নাম জানতে পারি ততদিন পর্যন্ত তাকে আমরা যাত্রী বলেই ডাকব।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে ইস্টিশানের বাইরে এসে যাত্রী একটা পথ ধরে এগিয়ে চলল। খানিক দূর অগ্রসর হয়েই একখানা দোতলা বাড়ির সামনে সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাড়িখানার দোতলার বারান্দায় একখানি সাইনবোর্ডে বড়-বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'শ্রীপুর স্বাস্থ্যনিবাস'। অল্পক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে যাত্রী বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল।

এই স্বাস্থ্যনিবাসটির একটুখানি পরিচয় দেওয়া দরকার। শ্রীপুরে যারা বেড়াতে আসেন, তাঁদের অনেকেই এই স্বাস্থ্যনিবাসে আশ্রয়



একজন যাত্রী এসে ইস্টিশনে নামল। পৃষ্ঠা ৬

নেন। এর মালিক হচ্ছেন মিস্টার দাস ও মিসেস্ দাস। তাঁরা বাঙালী খ্রীষ্টান। স্বাস্থ্যের খোঁজে যাঁরা এখানে এসে ওঠেন, এঁরা দুজনেই তাঁদের সেবা-যত্ন ও আদর-আপ্যায়নের ভার নেন, অবশ্য কয়েকটি রূপোর টাকার বিনিময়ে। তাঁরাও এই বাড়ির অন্য এক মহলে বাস করেন।

বাড়ির ভিতরে ঢুকেই একটি বড় হল-ঘর। সেটি হচ্ছে এখানকার সাধারণ বৈঠকখানা। মিস্টার ও মিসেস্ দাস প্রত্যহ এইখানে বসেই তাঁদের অতিথিদের সঙ্গে গল্পগুজব ও আলাপ-পরিচয় করেন।

আমাদের যাত্রীটি এই ঘরে ঢুকেই গম্ভীর স্বরে বললে, 'আমার একখানা ভালো ঘর চাই।'

মিসেস্ দাস তখন তাঁর কয়েকজন অতিথির সঙ্গে একমনে গল্প করছিলেন। যাত্রীর আকস্মিক প্রবেশে ও গম্ভীর কণ্ঠস্বরে ঘরের সকলেই চমকে উঠল। যাত্রী তার দস্তানা-পরা হাত দিয়ে একখানা একশো টাকার নোট বার করে আবার গম্ভীর স্বরে বললে, 'এই নিন আগাম টাকা, আমার একখানা ভালো ঘর চাই।'

না-চাইতেই আগাম একশো টাকা! বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় মিসেস্ দাসের প্রাণটা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কপাল না খুললে এমন অতিথি মেলে না।

মিসেস্ দাস তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আসুন, আসুন আমার সঙ্গে। আপনাকে বাড়ির সেরা ঘরই ছেড়ে দেব।'

মিসেস্ দাস যাত্রীকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বাড়ির দোতলায় রাস্তার ধারের বড় ঘরখানিই যাত্রীর জন্যে ছেড়ে দেওয়া হল। যাত্রী সেই ঘরের ভিতরে ঢুকে পোর্টম্যান্টোটি একটি টেবিলের উপরে রেখে দিল।

মিসেস্ দাস তাঁর নূতন অতিথিটির সঙ্গে ভালো করে আলাপ জমাবার চেষ্টায় বললেন, 'আপনি বুঝি বৈকালের ট্রেনে এখানে এসেছেন?'

যাত্রী জবাব না দিয়ে মিসেস্ দাসের দিকে পিছন ফিরে রাস্তার দিকের জানলার গরাদ ধরে দাঁড়াল। তারপর মুখ না ফিরিয়েই বললে, 'আমার ক্ষিধে পেয়েছে। এখুনি কিছু খাবার পাঠিয়ে দিন।'

আলাপটি ভালো করে জমল না বলে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে মিসেস্ দাস অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিনিট পনেরো পরে চাকরের সঙ্গে মিসেস্ দাস আবার ভিতরে এসে ঢুকলেন। যাত্রীকে শুনিয়ে চাকরকে ডেকে বললেন, 'ভিখু, টেবিলের ওপরে খাবারের থালাটা রাখ্।'

যাত্রী ঠিক আগের মতই পাথরের মূর্তির মতন জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিল। সে এবারেও মুখ না ফিরিয়েই বললে, 'আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন।'

মিসেস্ দাস নিজের মনেই বললেন, 'লোকটার টাকা আছে, কিন্তু ভদ্রতা-জ্ঞান মোটেই নেই।' প্রকাশ্যে বললেন, 'আপনি চা-টা খান্ কি ?'

যাত্রী বললে, 'মিনিট পনেরো পরে পাঠিয়ে দেবেন।'

মিসেস্ দাস ঘরের ভিতর আর দাঁড়ালেন না।

মিনিট পনেরো পরে ভিখুর সঙ্গে মিসেস্ দাস আবার ঘরের ভিতর ঢুকে দেখলেন, যাত্রী জানলাগুলো বন্ধ করে আধা-অন্ধকারে কোণের দিকে চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে বসে আছে। টেবিলের দিকে চেয়ে দেখলেন, তার জলখাবার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। বললেন, 'আপনার চা নিয়ে এসেছি।'

যাত্রী বললে, 'চা ঐখানে রেখে যান।'

ভিখু চায়ের সরঞ্জাম রেখে টেবিল থেকে জলখাবারের থালাগুলো সরাতে লাগল। মিসেস্ দাস সেই ফাঁকে যাত্রীকে আরো-একটু ভালো করে দেখে নেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ভালো করে কিছুই আন্দাজ করতে পারলেন না। যাত্রী তখনো তার মুখের ব্যাণ্ডেজ তো খোলেই নি, উপরন্তু গায়ের আলোয়ান, হাতের দস্তানা ও পায়ের

জুতো-মোজা পর্যন্ত ঠিক সেই ভাবেই পরে আছে। কেবল নীচের ঠোঁটের কাছ থেকে ব্যাণ্ডেজটি একটুখানি টেনে নামিয়ে রেখেছে—বোধহয় খাবার সুবিধার জন্যে। কিন্তু তার নাকের তলার দিকে চেয়ে মিসেস্ দাস ঠোঁটের কোন চিহ্নই দেখতে পেলেন না। তিনি ভাবলেন, আধা-অন্ধকারে বোধহয় তাঁর চোখের ভ্রম হচ্ছে। তবু তাঁর মনটা কেমন এক অস্বাভাবিক ভয়ে ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করতে লাগল। এ কি রকম রহস্যময় লোক! এ যেন মানুষের চোখের সামনে আসতে চায় না, সর্বদাই নিজেকে সাবধানে লুকিয়ে রাখতে চায়। পৃথিবীর আলো-হাওয়াকে এ যেন পরম শত্রু বলে মনে করে। কে এ? ওর সারা মুখখানায় ও কিসের ব্যাণ্ডেজ? কোন দৈব-দুর্ঘটনায় ওর মুখখানা কি ভীষণভাবে জখম হয়েছে? না, কোন সাংঘাতিক অস্ত্র-চিকিৎসায় ওর মুখের অবস্থা অমনধারা হয়েছে?

মিসেস্ দাস মনে মনে এমনি সব কথা নিয়ে তোলপাড় করছেন, এমন সময়ে যাত্রী হঠাৎ বললে, 'ইস্টিশানে আমার কতকগুলো লগেজ পড়ে আছে। সেগুলো আনবার কি উপায় করা যায় বলুন দেখি?'

যাত্রীর গলার আওয়াজ আর তেমন কর্কশ নয়। মিসেস্ দাস ভাবলেন, তাঁর স্বাস্থ্যনিবাসের সুখাদ্য খেয়ে তার মেজাজ নরম হয়ে গিয়েছে। যাহোক্, কথা কইতে নারাজ যাত্রীর সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ পেয়ে মিসেস্ দাস খুব খুশী হয়ে বললেন, 'সেজন্যে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব'খন।'

যাত্রী বললে, 'আজকেই সে ব্যবস্থা হতে পারে কি?

মিসেস্ দাস মাথা নেড়ে বললেন, 'আজ আর হয় না। মিস্টার দাস তাঁর এক বন্ধুকে দেখতে গেছেন, কখন ফিরবেন বলা যায় না। বুঝলেন মশাই, তাঁর বন্ধুটি ট্রেন থেকে পড়ে মাথা ফাটিয়ে বসে আছেন।' এই বলে যাত্রীর ব্যাণ্ডেজ-করা মুখের দিকে একবার কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার শুরু করলেন, 'আজকাল পথে-ঘাটে দৈব-দুর্ঘটনা বড় বেশী বেড়ে গেছে, না মশাই?'

মিসেস্ দাসের ইচ্ছা যে, যাত্রী নিজের মুখেই প্রকাশ করুক, তার মুখে ও মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কেন? কিন্তু যাত্রী সে ধারও মাড়ালে না, হঠাৎ গলার আওয়াজ বদলে বলে উঠল, 'আচ্ছা, আমার লগেজ কাল এলেই চলবে। এখন আমি একটু একলা থাকতে চাই।'

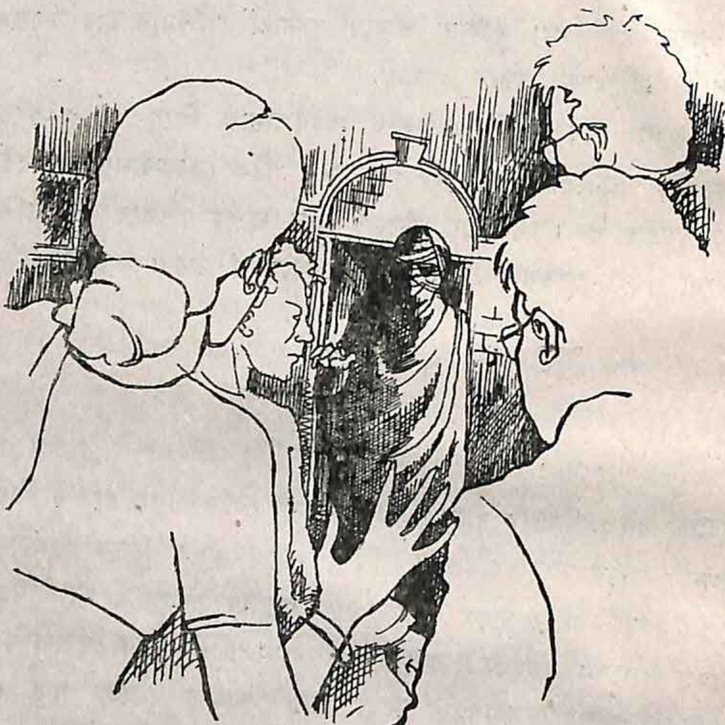
আমার সঙ্গে গল্প করতে রাজী নয়, এ কি রকম অসভ্য লোক! সবিস্ময়ে এই কথা ভাবতে ভাবতে অত্যন্ত অভিমান ভরে মিসেস্ দাস সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিসেস্ দাস নীচে একতলার বৈঠকখানায় গিয়ে ধপাস করে একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়লেন। ঠিক বৈঠকখানার উপরেই ছিল যাত্রীর ঘর। সে যে নিজের মনে ঘরের ভিতরে পায়চারি করছে, তারই আওয়াজ মিসেস্ দাসের কানের ভিতর এসে ঢুকল।

রতনবাবুর সন্দেহ ॥ দুই

খানিক পরে মিস্টার দাসের এক বন্ধু সেই বৈঠকখানায় এসে হাজির হলেন। তাঁর নাম রামরতন, কিন্তু সবাই তাঁকে ডাকে রতনবাবু বলে। তিনি মাঝে মাঝে এখানে তাঁর বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর সঙ্গে গল্প করতে আসেন এবং সেই সময়ে দু-একখানা টোষ্ট ও এক পেয়ালা চা পেলে খুব খুশী হয়ে সদ্ব্যবহার করে যান। স্বামীর বন্ধুদের জন্য এ রকম বাজে খরচ হওয়া মিসেস্ দাস মোটেই পছন্দ করেন না। বলেন, 'আমাদের স্বাস্থ্যনিবাস ব্যবসার জায়গা, দাতব্য ভোজনালয় নয়। তুমি তোমার বন্ধুদের সাবধান করে দিও।'

মিস্টার দাস তাঁর স্ত্রীর এই হুকুম পালন করেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু স্বাস্থ্যনিবাসে রতনবাবুর আনাগোনা বন্ধ হয় নি এবং এখানকার টোষ্ট ও চায়ের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র অরুচিও দেখা যায় নি।



যাত্রী ঘরে ঢুকেই বললে, 'একখানা ভালো ঘর চাই।' পৃষ্ঠা ৮

রতনবাবুর একটি ঘড়ির দোকান ছিল। আজ তাঁকে দেখেই মিসেস্ দাসের সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। যাত্রী যে ঘরে আছে সেই ঘরের একটা বড় ঘড়ি আজ দুদিন বন্ধ হয়ে গেছে, কিছুতেই চলছে না। মিসেস্ দাস স্থির করলেন, রতনবাবুকে অনেক চা ও টোষ্ট খাওয়ানো হয়েছে, তার বিনিময়ে তাঁকে দিয়ে বিনামূল্যে ঘড়িটাকে আজ সচল করে নিতে পারলে বোকামি করা হবে না।

অতএব মিসেস্ দাস সহাস্যমুখে রতনবাবুকে অভ্যর্থনা করে বললেন, 'আসুন, আসুন! আমি আপনার জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলুম।'

মিসেস্ দাস তাঁকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করবেন ও তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে থাকবেন, রতনবাবুর এমন সৌভাগ্য এর আগে আর কখনো হয় নি। কাজেই তিনি একেবারে আহ্লাদে-আটখানা হয়ে বললেন, 'বলেন কি মিসেস্ দাস! আমায় কি করতে হবে আজ্ঞা করুন।'

মিসেস্ দাস কোনরকম গৌরচন্দ্রিকা না করেই বললেন, 'ওপরের ঘরের একটা ঘড়ি খারাপ হয়ে গেছে, আপনি সেটা সারিয়ে দিতে পারবেন?'

রতনবাবু মিসেস্ দাসের সাদর অভ্যর্থনা ও মিষ্টি হাসির অর্থ বুঝতে পারলেন, কিন্তু মুখের ভাবে কিছু প্রকাশ না করেই বললেন, 'বেশ তো, এ আর এমন শক্ত কি? ঘড়িটা কোথায় আছে?'

'ওপরের ঘরে। আসুন আমার সঙ্গে।' এই বলে মিসেস্ দাস চেয়ার ছেড়ে উঠে রতনবাবুকে নিয়ে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিসেস্ দাস উপরে উঠে দেখলেন, যাত্রীর ঘরের দরজা বন্ধ। বাইরে থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঘরের ঘড়িটা মেরামত করতে হবে। একবার ভেতরে যেতে পারি কি?'

ভিতর থেকে আওয়াজ এল, 'আসুন।'

রতনবাবুকে নিয়ে মিসেস্ দাস ঘরের ভিতরে ঢুকলেন।

ঘরের কোণে চেয়ারে দুই হাতের ভিতরে মাথা রেখে যাত্রী হেঁটমুখে বসেছিল। সন্ধ্যা তখন আসন্ন। মিসেস্ দাস আলো জ্বালাবার চেষ্টা করতেই যাত্রী বলে উঠল, 'থাক্, এখুনি আলো জ্বালাতে হবে না। ...হ্যাঁ, ভালো কথা, আমার লগেজগুলো কাল সকালে পাবো কি ?'

মিসেস্ দাস বললেন, 'হ্যাঁ, তা বোধহয় পাবেন। আপনার লগেজগুলো কিসের ?'

'তার ভেতরে রাসায়নিক যন্ত্র আর অনেক রকম ওষুধের শিশি-বোতল আছে। শ্রীপুর নির্জন বলেই আমি এখানে এসেছি। নির্জনে আমি রাসায়নিক পরীক্ষা করতে চাই। আর শুনুন. কোনরকম গোলমালই আমি সহ্য করব না।'

মিসেস্ দাসের কৌতূহল আবার জেগে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি বলে ফেললেন, 'আপনি কি ডাক্তারী করেন ?'

যাত্রী সে-কথার জবাব না দিয়ে আপন মনেই বললে, 'আমি নির্জনে থাকতে ভালোবাসি। আমার চোখ এত খারাপ যে মোটেই আলো সইতে পারি না। সময়ে সময়ে আমাকে ঘরের দরজা-জানলা সব বন্ধ করে রাখতে হয়। অনেক সময় আমি আবার অন্ধকারেই থাকি। এ কথাগুলো দয়া করে মনে রাখবেন।'

মিসেস্ দাস বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়! আচ্ছা, আমার একটা কথার জবাব দেবেন কি ?'

যাত্রী বাধা দিয়ে বললে, 'এখন আপনারা এ-ঘরে যা করতে এসেছেন তাড়াতাড়ি করুন।' বলেই সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

মিসেস্ দাস আর সেখানে দাঁড়ালেন না, রাগে গসগস করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রতনবাবু একখানা টুলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালঘড়ির ডালা খুলে তার ভিতরটা পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ একবার মুখ

তুলে দেখলেন, যাত্রী তার নীল-রঙা ঠুলি-চশমার ভিতর দিয়ে এক-দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ দুটো দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু রতনবাবুর মনে হল যেন দু-দুটো অন্ধকারের গর্ত কট্‌মট্‌ করে তাঁকে নিরীক্ষণ করছে। তাঁর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সে ভাবটা সামলে নেবার জন্যে রতনবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, দেখছেন মশাই, আজকের আকাশের অবস্থাটা মোটেই ভালো নয়।'

যাত্রীর মূর্তি একটুও নড়ল না, কিন্তু সে কর্কশস্বরে বলে উঠল, 'একটা ঘড়ি ঠিক করতে কতক্ষণ লাগে? তাড়াতাড়ি কাজ সেরে সরে পড়ুন না।'

রতনবাবু অপ্রস্তুত স্বরে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ! এই আর এক মিনিটেই হয়ে যাবে।' তারপর মুখ বুজে চট্‌পট্‌ মেরামতি কাজ সেরে তিনি সে-ঘর থেকে অপরাধীর মত সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেলেন।

স্বাস্থ্যনিবাস থেকে বাইরে বেরিয়ে রতনবাবু নিজের বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন। খানিক পরেই পথে মিস্টার দাসের সঙ্গে দেখা।

তাঁকে দেখেই মিস্টার দাস বলে উঠলেন, 'আরে, আরে, রতন যে! খবর কি?'

রতনবাবু মুখ ভার করে বললেন, 'দাস, খবর খুব ভালো নয়।'

'কেন?'

'তোমার বাড়িতে একটা খুনে কিম্বা ডাকাত এসে আড্ডা গেড়েছে।'

মিস্টার দাস চমকে উঠে বললেন, 'কি বল্‌চ হে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ফেরারী আসামী। দেখছি স্বাস্থ্যনিবাস এবার পুলিশের জিম্মায় যাবে।'

মিস্টার দাস বললেন, 'বটে, বটে, তাই নাকি? আচ্ছা, এখনি গিয়ে আমি সব ব্যবস্থা করছি।' এই বলে দ্রুতপদে তিনি বাড়িমুখো হলেন।

কিন্তু স্বাস্থ্যনিবাসে ফিরে তিনি একটি টুঁ শব্দ করবার আগেই মিসেস্ দাসই সচিৎকারে তাঁকে আক্রমণ করলেন। বললেন, 'তোমার মতন মানুষের হাতে পড়ে হাড় আমার ভাজা-ভাজা হয়ে গেল। আমি মরছি নিজের জ্বালায়, আর উনি বেড়াচ্ছেন স্ফুর্তি করে। বাড়ি থেকে কখন বেড়িয়েছিলে বলো দিকি?'

মিস্টার দাস আমতা-আমতা করে বললেন, 'একেবারে রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করে আমাকে আর ভয় দেখিও না গো! আমি তো তোমার কাজেই বাইরে গিয়েছিলুম।'

মিসেস্ দাস একটু নরম হয়ে বললেন, 'এখানে একজন নতুন লোক এসেছে, আর তুমি রইলে বাইরে। ফরমাশ কে খাটে বলো দিকি?'

মিস্টার দাস বললেন, নতুন লোক! কে নতুন লোক? শুনলুম, তাকে নাকি চোর-ডাকাত-খুনের মতন দেখতে?'

মিসেস্ দাস তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, 'সে তো আমাদের জামাই নয়। সে দেখতে ভালো কি মন্দ, তা নিয়ে আমাদের দরকার কি?'

মিস্টার দাস বললেন, 'না, তা নিয়ে আমাদের দরকার নেই বটে. কিন্তু তাকে পুলিশের দরকার হতে পারে।'

মিসেস্ দাস রাশভারী চালে বললেন, 'থামো, থামো। তোমাকে আর বেশী বাজে বকতে হবে না, নিজের চরকায় তেল দাওগে যাও।'

মিস্টার দাসের আর কিছু বলবার সাহস হল না। তিনি মনে মনে এই ভাবতে ভাবতে অন্যদিকে চলে গেলেন, 'মেয়েরা চিরকালই এমনি বোকা হয়। বিপদে না পড়লে তারা বিপদকে বিপদ বলে বুঝতেই পারে না।'

পরের দিন সকালবেলায় যাত্রীর লগেজগুলো এসে হাজির হল।

গাড়ি থেকে লগেজগুলো যখন নীচে নামানো হচ্ছিল, যাত্রীও তখন সেখানে এসে ব্যস্ত হয়ে তদ্বির করতে লাগল। লগেজের মধ্যে ছিল গোটা-দুয়েক বড়-বড় পোর্টম্যাণ্টো, দু-বাক্স ভর্তি মোটা-মোটা বই, আর অনেকগুলো শিশি বোতল—তাদের ভিতরে টল্‌টল্ করছে নানান রঙের ওষুধের মত তরল জিনিষ।

মিস্টার দাসের একটা কুকুর ছিল, তার নাম হচ্ছে ডগি। যাত্রী তাকে দেখতে পায় নি, কিন্তু সে যাত্রীকে দেখতে পেল। দেখে সে আর বেশী কিছু করলে না, দৌড়ে এসে কেবল যাত্রীর পায়ের উপরে দিলে দাঁত খিঁচিয়ে এক কামড়। মিস্টার দাস তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ডগিকে একটা লাথি মেরে নিজের বীরত্বের পরিচয় দিলেন। ডগি কেঁউ-কেঁউ করে কাঁদতে কাঁদতে সরে পড়ল। যাত্রীর কাপড়ের খানিকটা ছিঁড়ে ফালা-ফালা হয়ে গিয়েছিল, সেও তাড়াতাড়ি তার ঘরের উদ্দেশ্যে উপরে উঠে গেল।

মিসেস্ দাস বললেন, 'যেমন মনিব তেমনি তার কুকুর। তোমার কুকুর যদি অতিথিদের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করে তাহলে শীগগিরই আমাদের স্বাস্থ্যনিবাস তুলে দিতে হবে।'

মিস্টার দাস বললেন, 'সত্যি, ডগির অপরাধ আমি স্বীকার করছি। ভদ্রলোকের কি হল আমি এখুনি গিয়ে দেখে আসছি।'

তিনি সোজা উপরে উঠে গেলেন! যাত্রীর ঘরের দরজা খোলাই ছিল, চৌকাঠ পার হয়ে তিনি ঘরের ভিতর গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঘরের জানলাগুলো আগেকার মতই বন্ধ ছিল। ভিতরের আধা-অন্ধকারে স্পষ্ট করে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু মিস্টার দাস যেন কি একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেলেন, যেন ছায়া-ছায়া

একটা নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে, যেন একখানা বাহুহীন হস্ত শূন্যে ভাসতে ভাসতে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। তারপর কি যে হল স্পষ্ট বোঝা গেল না, কিন্তু মনে হল, কে যেন এক ধাক্কা মেরে তাঁকে ঘরের বাইরে বার করে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে দুম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল ও খিল দেওয়ার শব্দ হল। ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটল যে মিস্টার দাস কিছুই আন্দাজ করতে পারলেন না। ছায়াময় ঘর, অস্পষ্ট একটা আকারের আভাস ও ভীষণ এক ধাক্কা! অত্যন্ত অবাক্ হয়ে মিস্টার দাস ভাবতে লাগলেন, তিনি স্বচক্ষে যা দেখলেন সেটা কী?

হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে মিস্টার দাস চিন্তিত মুখে নীচে নেমে বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলেন। সেখানে তখন স্বাস্থ্যনিবাসের ভাড়াটে বাসিন্দাদের জটলা শুরু হয়ে গেছে এবং মিসেস্ দাস সকলের সামনে দাঁড়িয়ে হাত-মুখ নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন, 'পৃথিবীতে যত রকমের জীব আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ওঁচা জীব হচ্ছে কুকুর। আর পৃথিবীতে যত রকমের কুকুর আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে ওঁচা কুকুর হচ্ছে ডগি। স্বাস্থ্যনিবাসের অতিথিদের ওপরে ডগির কোনই দরদ নেই। ভদ্রলোককে সে আজ কামড়ে দিয়েছে। না জানি এখন তাঁর কতই না কষ্ট হচ্ছে!'

মিস্টার দাস বললেন, 'তোমার অতিথির জন্যে তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না। বোধহয় তাঁর বিশেষ কিছুই হয় নি। এখন তাঁর লগেজগুলো ঘরের ভেতরে আনাবার ব্যবস্থা কর।'

পিছন থেকে গলার আওয়াজ ভেসে এল, 'না, না, আমার কিছুই হয় নি। লগেজগুলো তাড়াতাড়ি আমার ঘরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করুন।'

সকলে ফিরে দেখলে, জামা-কাপড় বদলে যাত্রী আবার নীচে নেমে এসেছে। লগেজগুলো যেই ঘরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল, অমনি যাত্রীর আর তর্ সইল না। তখনি ব্যস্তভাবে সে পোর্ট্ম্যান্টো ও বাক্সগুলো খুলে ফেললে। তাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল মোটা

বোতল, বেঁটে বোতল, ঢ্যাঙা বোতল; কোনটার রং লাল, কোনটার নীল, কোনটার বা সবুজ। অনেকগুলোর গায়ে বড়-বড় হরফে 'বিষ' বলে লেখা রয়েছে। পাতলা পুরু লম্বা ছোট কত রকমের বই! টেবিলের উপরে ঐসব শিশি-বোতল সাজিয়ে নিয়ে, সামনের চেয়ারে বসে যাত্রী একমনে কি কাজ করতে লাগল।

দুপুর বেলায় মিসেস্ দাস যখন উপরে এলেন, তখন ঘরের চেহারা দেখেই তাঁর চক্ষুস্থির। প্যাকিংয়ের চটে, খড়ের টুকরোয় ও দড়িদড়ায় তাঁর ঘরের মেঝে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তিনি তখনি সেই জঞ্জালগুলোকে নিজের হাতে ঘরের ভিতর থেকে বিদায় করে দিতে লাগলেন। যাত্রী তখন এমনই একমনে কাজ করছিল যে মিসেস্ দাসের অস্তিত্ব টেরই পেল না।

মিসেস্ দাস ঘর পরিষ্কার করে বললেন, 'আপনি চারদিক এমন নোংরা করে রাখবেন না তাহলে স্বাস্থ্যনিবাসের বদনাম হবে।'

যাত্রী চমকে ফিরে তাকালে। তখন সে চোখ থেকে চশমা খুলে রেখেছিল। মিসেস্ দাসের মনে হল, তার চোখের কোটরে যেন চোখ দুটো নেই, খালি দুটো গর্ত! মিসেস্ দাস ভাবলেন, হয়তো তাঁরই দেখবার ভুল। যাত্রী তখনি চশমাখানা আবার পরে নিলে। তারপর বললে, 'আপনি সাড়া না দিয়ে ঘরের ভেতরে এলেন কেন?'

মিসেস্ দাস বললেন, 'আমি সাড়া দিয়েছিলুম, আপনি শুনতে পান নি।'

যাত্রী বাধা দিয়ে বললে, 'হতে পারে, কিন্তু সামান্য একটু শব্দেই আমার কাজের বড় ক্ষতি হয়।'

মিসেস্ দাস বললেন, 'তাহলে আপনি তো এক কাজ করতে পারেন। এবার থেকে আপনি যখন কাজ করবেন, ঘরের দরজায় ভেতর থেকে খিল দিয়ে রাখবেন।'

'এ খুব সঙ্গত কথা।'

'কিন্তু মশাই, এই খরগুলো…'

যাত্রী আবার বাধা দিয়ে বললে, 'ঘরের ভেতরে খরকুটো পড়লো তা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। যদি কিছু লোকসান হয়, আপনি আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করে নেবেন।'

মিসেস্ দাস কেবল বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক নন, তাঁকে নাছোড়বান্দাও বলা যেতে পারে। তিনি বললেন, 'কিন্তু আজ এই যে আপনি আমার ঘর-দোর নোংরা করেছেন…'

যাত্রী বললে, 'তার জন্য আমার পাঁচ টাকা জরিমানা হল। ব্যস, এখন আর কোন কথা নয়।'

মিসেস্ দাস খুব খুশী মনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাত্রীর কর্কশ কথা ও ব্যবহারের জন্যে এখন আর তাঁর মনের উপরে কোন দাগই পড়ল না, কারণ এমন পাঁচ টাকা জরিমানা পেলে মনের সব ময়লাই ধুয়ে যায়।

এরই খানিকক্ষণ পরে মিসেস্ দাস যখন আবার যাত্রীর ঘরের সুমুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বন্ধ-দ্বারেব ওপার থেকে হঠাৎ একটা ঝন্‌ঝনানির আওয়াজ তাঁর কানে ভেসে এল। মনে হল, কে যেন শিশি-বোতল সাজানো টেবিলের উপরে সজোরে এক ঘুষি বসিয়ে দিলে। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং তারপরেই যাত্রীর গলার স্বর শুনলেন আমি আর পারছি না, আমি আর পারছি না।…এর জন্যে আমার সারা জীবনই কেটে যাবে। অস্থির হবো না? অস্থির না হয়ে আর উপায় কি? হা-রে নির্বোধ।'

হাত নেই, হাতা ॥ চার

শ্রীপুরের স্বাস্থ্যনিবাসে যাত্রীর দিনগুলো একই ভাবে কাটতে লাগল।

শ্রীপুরের ঘরে-ঘরে কিন্তু গুজবের অন্ত নেই। যাত্রীর সেই আপাদমস্তক-ঢাকা ব্যাণ্ডেজ-করা কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি দেখলেই শ্রীপুরের পথ থেকে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা 'ভূত! ভূত!' বলে চিৎকার করে ছুটে পালিয়ে যায়! পথের উপরে রাত্রিকালে যাত্রীর মূর্তি দেখলে ছেলেমেয়েদের বাপেদেরও গা ছম্‌ছম্ করে ওঠে। যাত্রী কারুর সঙ্গে মেশে না, তার পরিচয়ও কেউ জানে না। এত ঠাঁই থাকতে কেন যে সে শ্রীপুরে এসে আবির্ভূত হয়েছে, সে রহস্যও কেউ বুঝতে পারে না। শ্রীপুরের পাড়ায়-পাড়ায় যাত্রীর কথা নিয়ে উত্তেজনার অন্ত নেই।

রতনবাবুর আগেকার মত তো আমরা আগেই জানতে পেরেছি। আগে তিনি যাত্রীকে খুনী ও ডাকাত বলেই প্রচার করতেন। এখন তাঁর মতে, যাত্রী হচ্ছে 'সর্বনেশে স্বদেশী বোমাওয়ালা'!

যাত্রী সারাদিন বন্ধ-দরজার আড়ালে বসে তার শিশি-বোতল আর বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে, মাঝে মাঝে ঘরের ভিতরে পায়চারি করতে করতে নিজের মনেই নিজের সঙ্গে কথাবার্তা কয় এবং যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে আসে, তখন আগাপাস্তলা জামা-কাপড়ে মুড়ে শ্রীপুরের নির্জন পথে একাই বেড়াতে বেরোয়।

কেউ কেউ মিসেস্ দাসকে জিজ্ঞাসা করে, 'যাত্রীর নাম কি?'

মিসেস্ দাস জবাব দেন, 'উনি নাম আমাকে বলেছিলেন, কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি।'

কথাটা কিন্তু সত্য নয়। নিজের মুখ ও যাত্রীর সুনাম রক্ষা করবার জন্যেই মিসেস্ দাস ও-রকম বাজে কথা বলতে বাধ্য হন। যাত্রীর ব্যবহার খুব ভদ্র ও গলার আওয়াজ খুব মিষ্টি না হলেও স্বাস্থ্যনিবাসের বিলের টাকা কোনদিনই সে বাকি রাখে নি এবং মিসেস্ দাসকে মাঝে মাঝে জরিমানার টাকা দিতেও কোনদিন সে আপত্তি করে নি। মিসেস্ দাসের মতে, এমন প্রথম শ্রেণীর অতিথি তাঁর জীবনে মাত্র একবারই পাওয়া গেছে।

মিস্টার দাস একথা মানতেন না। যাত্রীকে তাঁর মনে ধরে নি। রতনবাবুর মতন তিনিও যাত্রীকে মনে মনে সন্দেহ করতেন।

কিন্তু মিসেস্ দাসের সামনে এ সন্দেহ প্রকাশ করলেই ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে উঠত। তিনি ঘন-ঘন হাত-মুখ নেড়ে বলতেন, 'আহা, কোন দৈব-দুর্ঘটনায় বেচারীর মুখে চোট লেগেছে, তাই সে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে থাকে। স্বাস্থ্যনিবাসে সে সারতে এসেছে। চোর-ডাকাত হলে সে কখনো বিলের টাকা এমন করে শোধ করতো ?'

শান্তি ভঙ্গের ভয়ে মিস্টার দাস আর কিছুই বলতেন না।

শ্রীপুরে এক সরকারী ডাক্তার ছিলেন, তাঁর নাম মানিকবাবু। নানান লোকের মুখে নানান কথা শুনে একটা বাজে ওজর নিয়ে মানিকবাবু একদিন যাত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

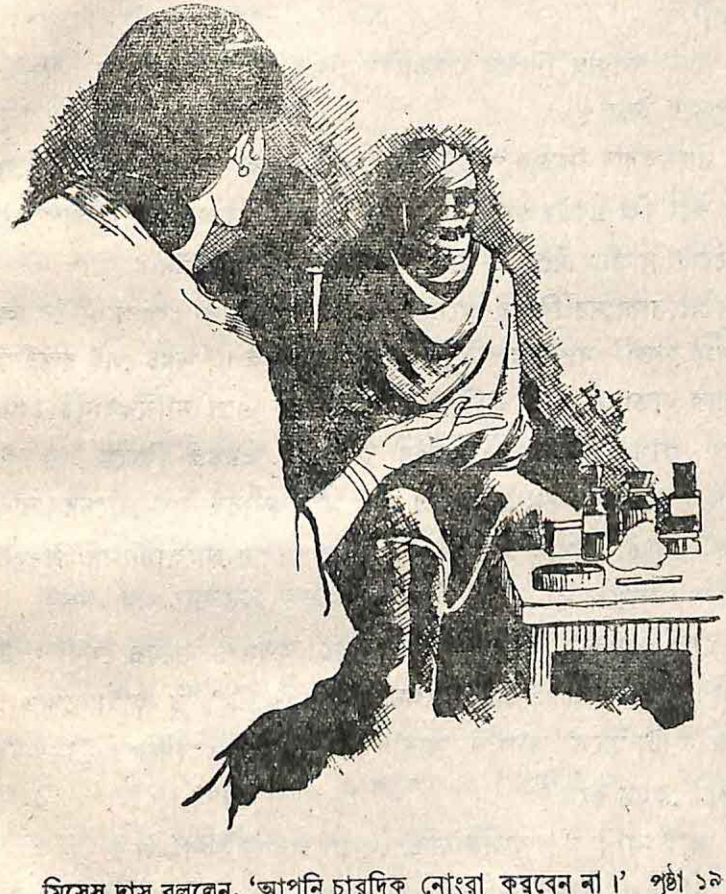
মানিকবাবু ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখলেন, ইজিচেয়ারের উপরে একখানা বই নিয়ে ব্যাণ্ডেজ-করা মুখে এক ব্যক্তি শুয়ে আছে।

তাঁকে দেখেই যাত্রী উঠে বসে গম্ভীর স্বরে বললে, 'এখানে আপনার কি দরকার ?'

মানিকবাবু বললেন,' মশাই, আমি সরকারী হাসপাতালের জন্যে চাঁদা আদায় করতে এসেছি।'

যাত্রী ফ্যাঁচ করে হেঁচে ফেলে বললে, 'বটে !'

মানিকবাবু শুধোলেন, 'কিছু দেবেন কি ?'



মিসেস্ দাস বললেন, 'আপনি চারদিক নোংরা করবেন না।' পৃষ্ঠা ১৯

যাত্রী আবার হেঁচে বললে, 'সে কথা পরে ভাবা যাবে।' তারপর আবার হাঁচলে।

মানিকবাবু বললেন, 'অত হাঁচছেন কেন? সর্দি হয়েছে নাকি?'

যাত্রী বললে, 'হ্যাঁ।'

মানিকবাবু বললেন, 'আমি ডাক্তার। সর্দির একটা ওষুধ লিখে দেব?'

যাত্রী আবার নিজের কেতাবের দিকে তাকিয়ে বললে, 'সেটা আপনার ইচ্ছে।'

মানিকবাবু নিজের পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ আর পেন্সিল বার করে কি একটা ওষুধের নাম লিখলেন। তারপর সেই কাগজের টুকরোটা যাত্রীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নিন।'

আলোয়ানের ভিতর থেকে একটা জামার হাতা বেরুল। কেবল জামার হাতা…মানুষের হাতের কোন চিহ্ন নেই। অথচ সেই হস্তহীন জামার হাতা ঠিক স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে এসে মানিকবাবুর হাত থেকে কাগজের টুকরোটা গ্রহণ করলে। ভয়ঙ্কর বিস্ময়ে তাঁর দুই চোখ ছানাবড়ার মতন হয়ে উঠল এবং মানিকবাবুর মুখ-চোখের ভাব দেখেই যাত্রী জামার হাতাটা সাঁৎ করে আবার আলোয়ানের ভিতরে ঢুকিয়ে ফেললে।

সেই কনকনে শীতেও মানিকবাবুর কপালে ঘামের রেখা ফুটে উঠল। অস্ফুটস্বরে তিনি বললেন, 'আপনার কি হাত কাটা গেছে? কিন্তু কাটা-হাতে আপনি আমার হাত থেকে কাগজের টুকরোটা নিলেন কেমন করে?'

'তাই নাকি?' বলেই যাত্রী সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল।

মানিকবাবু দু'পা পিছিয়ে এসে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার হাত নেই, খালি জামার হাতা আছে!'

যাত্রী দু'পা এগিয়ে এসে ব্যঙ্গের স্বরে বললে, 'আমার হাত নেই, খালি জামার হাতা আছে? বটে!'…আলোয়ানের ভিতর থেকে

আবার হস্তহীন জামার হাতা বেরুল···হাতাটা একেবারে মানিকবাবুর মুখের সামনে এসে হাজির হল, তারপর কে যেন দুটো অদৃশ্য আঙুল দিয়ে তাঁর নাকটা খুব জোরে মলে দিলে।

এরপরেও কোন ভদ্রলোকেরই সে-ঘরে থাকা উচিত নয়। মানিকবাবু তিন লাফে দরজা পেরিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে পড়লেন। তারপর হুদ্দার করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনলেন, ঘরের ভিতর থেকে যাত্রী অট্টহাস্য করে উঠল।

স্বাস্থ্যনিবাসের বৈঠকখানায় বসে মিস্টার দাস তখন মিসেস্ দাসের সঙ্গে তর্ক করছিলেন। হঠাৎ মড়ার মতন সাদা মুখ নিয়ে মানিকবাবুকে সেখানে আসতে দেখে তিনি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কি হয়েছে মানিকবাবু, অত ছুটে আসছেন কেন? ডগি তাড়া করেছে বুঝি?'

মানিকবাবু ছুটে গিয়ে একখানা চেয়ারের উপরে ধপাস্ করে বসে পড়ে ভীষণ হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'মিস্টার দাস! ওঃ, হাত নেই, শুধু জামার হাতা!'

মিস্টার দাস সবিস্ময়ে বললেন, 'কি বলছেন ডাক্তারবাবু? হাত নেই, জামার হাতা!'

মানিকবাবু বললেন, 'হাঁা, হ্যাঁ!···হাত নেই, জামার হাতা। ওপরের ঘরের সেই ভূতুড়ে লোকটার হাত নেই, শুধু জামার হাতা আছে। জামার হাতা দিয়ে সে আমার নাক মলে দিলে।' বলেই তিনি দুই চোখ কপালে তুলে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

সরকারী হাসপাতালের এক অংশে সরকারী ডাক্তার মানিকবাবু স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাস করতেন।

হস্তহীন জামার হাতা দেখে মানিকবাবুর শরীরটা আজ বেজায় কাহিল হয়ে পড়েছিল। মিস্টার ও মিসেস্ দাস ও নিজের স্ত্রী বিমলার কাছে বারবার তিনি এই গল্প বলেছেন, কিন্তু তাঁর কথায় ওঁরা কেউই বিশ্বাস করতে রাজী হন নি। তাঁদের সকলেরই মত হচ্ছে, জামার-হাতাটা হয়তো বেশী লম্বা ছিল বলেই হাতখানা তিনি দেখতে পান নি। শেষটা মানিকবাবু নিজেও মনে করলেন, হয়তো সেই কথাই ঠিক হবে, তাঁরই চোখের ভুল।

অনেক রাতে হঠাৎ মানিকবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতেই তিনি শুনলেন, তাঁর স্ত্রী বিমলা তাঁকে ধাক্কা মারতে মারতে বলছেন, 'ওগো ওঠো! শীগগির ওঠো!'

মানিকবাবু ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বললেন, 'কি গো, কি হয়েছে?'

'চোর, চোর! বাড়িতে চোর এসেছে!'

চোর নামে কি যাদু আছে? একপলকে মানিকবাবুর সব জড়তা কেটে গেল। এক লাফে ঘরের কোণে গিয়ে একগাছা মোটা লাঠি তুলে নিয়ে, মাথার উপরে বন্‌বন্‌ করে ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি বললেন, 'কোথায় সেই বদমাইস? দেখিয়ে দাও আমাকে।'

স্বামীর বীরত্ব দেখে বিমলা আশ্বস্ত হলেন না, তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আপাতত তোমার লাঠি ঘোরানো থামাও। চোর এ-ঘরে নেই।'

মানিকবাবু স্ত্রীর কথামত কাজ করে বললেন, 'তবে সে হতভাগা কোথায়?'

বিমলা বললেন, 'পাশের ঘরে। চুপিচুপি আমার সঙ্গে এসো, নইলে তাকে ধরতে পারবে না।'

দুজনে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়েই শুনলেন, অন্ধকারে ফ্যাঁচ করে কে হেঁচে ফেললে। তারপরেই সুইচ টিপে কে আলো জ্বাললে! এরপরই শোনা গেল, কে যেন দেরাজের দরজাটা টেনে খুলে ফেললে।

মানিকবাবু একেই তো চোর-টোর পছন্দ করতেন না, তার উপরে যখন তাঁর মনে পড়ল, দেরাজের ভিতরে আজ সকালেই তিনি পঁয়ত্রিশখানা দশ টাকার নোট রেখে দিয়েছেন, তখন আর কিছুতেই তিনি শান্ত হয়ে থাকতে পারলেন না। 'কে রে, কে রে' বলে বিকট স্বরে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে এবং লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন।

বিমলাও ঘরে ঢুকে বললেন, 'ওগো থামো, থামো।'

কিন্তু মানিকবাবু থামলেন না, দ্বিগুণ উৎসাহেই লাঠি ঘোরাতে লাগলেন।

বিমলা আবার বললেন, 'ওগো মহাবীর, আর লাঠি ঘুরিয়ে কাজ নেই। চোর পালিয়েছে।'

লাঠি ঘোরানো থামিয়ে মানিকবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন, পালিয়েছে! কোন্ দিক দিয়ে পালাল?'

বিমলা বললেন, 'জানি না।'

মানিকবাবু অবাক হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, সত্যই ঘরের মধ্যে কেউ নেই। এ ঘরের দরজা তো মোটে একটি, আর তার সামনে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা দুজনে। তবে চোর পালাল কোন্ দিক দিয়ে?

মানিকবাবু বললেন, কিন্তু তখন ঘরের ভেতরে হাঁচলে কে?'

বিমলা বললেন, 'আর ঘরের ভেতরে সুইচ টিপে আলো জ্বাললেই বা কে?'

মানিকবাবু বললেন, 'আর দেরাজটাই বা খুলল কে?'

বিমলা দেরাজের কাছে গিয়ে উঁকি মেরে বললেন, 'আর তোমার

দেরাজের ভেতর থেকে সাড়ে-তিনশো টাকাই বা গেল কোথায় ?'

এসব কথার উত্তর কেউ দিল না বটে, কিন্তু ঘরের ভিতরেই কে আবার ফ্যাঁচ করে হেঁচে ফেললে।

মানিকবাবু ও বিমলা উভয়েই ভয়ানক চমকে উঠলেন।

তারপরই তাঁরা হতভম্ব হয়ে দেখলেন যে, ঘরের দরজাটা আপনা-আপনি আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, বাহির থেকে দরজায় কে শিকল তুলে দিলে।

বিমলা দৌড়ে গিয়ে দরজাটা টেনে বললেন, 'দরজা কে বন্ধ করে দিয়ে গেল ?'

মানিকবাবুর হাত থেকে প্রথমে লাঠিটা খসে পড়ল। তারপর তিনি নিজেও কাঁপতে কাঁপতে মাটির উপরে বসে পড়লেন এবং পরক্ষণেই কপালে দুই চোখ তুলে তিনি বললেন, 'গিন্নী! হাত নেই, খালি জামার হাতা! মানুষ নেই, তবু হাঁচি! চোর নেই, তবু টাকা লোপাট! গিন্নী, আমাকে তুমি ধরো, আমার ঘাড়ে আজ ভূতে ভর করেছে!' বলেই তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

বিমলা স্বামীর কাছে গিয়ে বসে পড়তে পড়তে শুনতে পেলেন, ঘরের বাইরে কে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল।

টেবিল-চেয়ারের নাচ ॥ ছয়

যে-সময়ে মানিকবাবু চোখ কপালে তুলে অজ্ঞান হয়ে গেলেন, ঠিক সেই সময়ে স্বাস্থ্যনিবাসে আর এক দৃশ্যের অবতারণা হল।

মিসেস্‌ দাসের শরীর অনেক রাত্রে হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়াতে মিস্টার দাস একটা ওষুধের খোঁজে বৈঠকখানার দিকে গেলেন।

যাত্রীর ঘরের সুমুখ দিয়ে যাবার সময় মিস্টার দাস অবাক হয়ে দেখলেন, সে-ঘরের দরজা খোলা রয়েছে!

তাঁর কেমন সন্দেহ হল। দরজার পাশেই আলোর সুইচটা ছিল, আলো জ্বেলে দেখলেন, ঘরের ভিতরে যাত্রী নেই। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন, রাত তখন তিনটে। এত রাত্রে যাত্রী কোথায় গেল? ভাবতে ভাবতে তিনি নেমে গিয়ে বৈঠকখানার ভিতরে ঢুকলেন। তারপর ওষুধের শিশিটা নিয়ে ফিরে আসবার সময় তাঁর চোখ পড়ল সদর দরজার উপরে। সদর দরজার ভিতর দিকের খিল খোলা। মিস্টার দাসের বেশ মনে পড়ল, তিনি নিজের হাতে খিল লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

কিছুই আর বুঝতে বাকি রইল না।. তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে মিসেস্ দাসকে ডেকে বললেন, 'ওগো, শুনছো! ব্যাপার গুরুতর।'

মিসেস্ দাস তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললেন, 'তার মানে?'

'রতনবাবুর কথাই ঠিক। আমাদের এই নতুন ভাড়াটেটি হয় খুনী, নয় ডাকাত, নয় স্বদেশী বোমাওয়ালা।'

মিসেস্ দাস এবারে দাঁড়িয়ে উঠে আবার বললেন, 'তার মানে?'

'সে লোকটা ঘরে নেই। সদর দরজা খোলা। এই নিশুতি রাতে বাড়ির বাইরে সে কি করতে গেছে?'

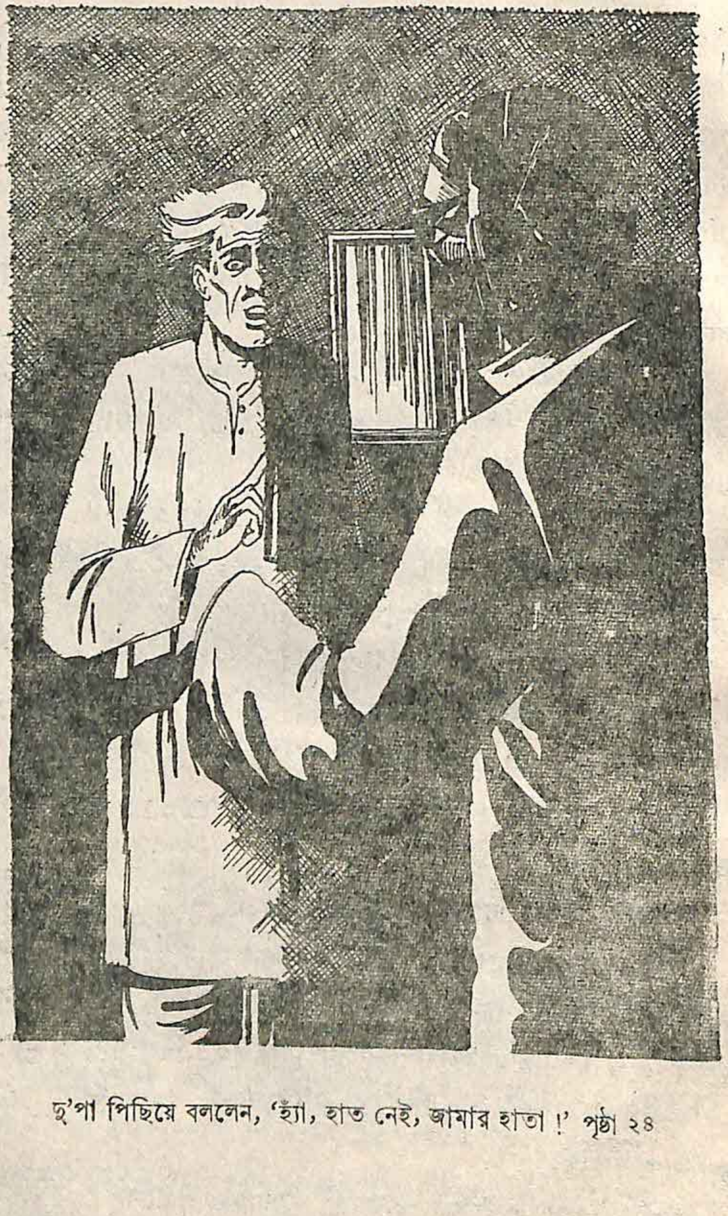
মিসেস্ দাস হাত-মুখ নেড়ে বললেন, 'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

'তাহলে নিজের চোখে দেখবে এসো।'

দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শুনলেন, সদর দরজা খোলার ও বন্ধ করার শব্দ। দুজনেই বিস্মিত হয়ে দুজনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন, কিন্তু কেউ কিছু বললেন না।

দুজনে যখন সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, হঠাৎ ফ্যাচ্ করে হাঁচির শব্দ হল।

মিস্টার দাস ভাবলেন, তাঁর স্ত্রী বোধহয় হাঁচলেন। মিসেস্ দাসের ধারণা হল ঠিক উল্টো, এ হাঁচি নিশ্চয়ই তাঁর স্বামীর।



দু'পা পিছিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হাত নেই, জামার হাতা!' পৃষ্ঠা ২৪

মিসেস্ দাস যখন যাত্রীর ঘরের কাছে এসেছেন, তখন ঠিক তাঁর কাঁধের উপরে আবার কে হেঁচে দিলে। এবারে চমকে মুখ ফিরিয়ে তিনি দেখলেন, মিস্টার দাস তাঁর কাছ থেকে প্রায় দশ-বারো হাত তফাতে আছেন। অথচ হাঁচির শব্দ হল ঠিক তাঁর কানের কাছেই। মিসেস্ দাস অত্যন্ত বিস্মিত হলেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না!

দুজনে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। যাত্রীর জুতো, জামা, কাপড়, আলোয়ান ও সেই বিশ্রী ব্যাণ্ডেজগুলো ঘরের মেঝেয়, টেবিলের ও বিছানার উপরে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

আচম্বিতে তাঁরা স্তম্ভিত চোখে দেখলেন, জুতো-জোড়া প্রথমে সজীব হয়ে নড়ে উঠল, তারপর গট্‌গট্ করে বিছানার কাছে গিয়ে থেমে গেল।

মিসেস্ দাস হতভম্বের মতন দুই চোখ দুহাতে রগ্‌ড়ে আবার ভালো করে চাইতেই দেখলেন, যাত্রীর ঠুলি-চশমাখানা শূন্যে স্থির হয়ে তাঁর দিকেই যেন কট্‌মট্ করে চেয়ে আছে।

পরক্ষণেই ঘরের টেবিলটা হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে হড়াৎ করে এগিয়ে এসে মিস্টার দাসকে মারলে এক ভীষণ ধাক্কা।

তারপরই চেয়ারখানা হঠাৎ শূন্যে লাফিয়ে উঠল এবং বেগে মিসেস্ দাসের দিকে তেড়ে এল। কিন্তু মিসেস্ দাস চেয়ারের মনোবাসনা পূর্ণ করলেন না, তীরের মতন ছুটে গিয়ে ঘরের বাইরে পালিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী যে এমন বেগে ছুটতে পারেন, মিস্টার দাস এতদিনেও তা জানতে পারেন নি। বলা বাহুল্য, তিনিও আর সে-ঘরে রইলেন না।

মিসেস্ দাস নিজের ঘরের সুমুখে গিয়ে মাটির উপরে ধড়াস্ করে আছাড় খেয়ে পড়লেন এবং সে অবস্থায় যেমন করে চ্যাঁচানো উচিত, ঠিক তেমনি করেই চ্যাঁচাতে কিছুমাত্র কসুর করলেন না।

সে-রাত্রে স্বাস্থ্যনিবাসের সমস্ত যাত্রীদের ঘুম ভেঙে গেল। সকলেই ঘটনাস্থলে ছুটে এল। জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'ব্যাপার

কি ? কি হয়েছে ? আগুন লেগেছে ? ডাকাত পড়েছে নাকি ?'

মিসেস্ দাস হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে হাত নেড়ে-নেড়ে বিনিয়ে-বিনিয়ে বললেন, 'হায়, হায়, হায় ! ওই চেয়ার যে আমার বাবার দেওয়া গো ! অমন পুরানো আর বিশ্বাসী চেয়ার কিনা আজ আমাকেই তেড়ে এলো ? ওগো, আমাদের ঐ ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা নতুন ভাড়াটেটা ভূতের সর্দার ! তার মন্ত্রে আমার পুরানো টেবিল-চেয়ারের ঘাড়ে ভূত চেপেছে। সারা ঘর জুড়ে টেবিল আর চেয়ার নাচ আরম্ভ করেছে। আমি কেতাবে পড়েছি, ভূতে পেলেই টেবিল-চেয়ারও জ্যান্ত হয়ে নাচতে থাকে।'

মিস্টার দাস বললেন, 'হ্যাঁ, কেতাবে আমিও টেবিল-চেয়ার জ্যান্ত হওয়ার কথা পড়েছি বটে ! কিন্তু খালি-জুতো যে জ্যান্ত হয়ে নিজেই হাঁটাহাঁটি শুরু করে, কেতাবে এমন কথা তো কখনো পড়ি নি।'

মিসেস্ দাস বললেন, 'আর সেই চশমাখানা ? সেখানাও তো ঘরময় পাখীর মত উড়ে বেড়াচ্ছিল ! মাগো মা, এমন অনাসৃষ্টি কেউ কখনো দেখেছে না শুনেছে ?'

যখন সকলে মিলে এমনি হৈ-চৈ করছে, ঠিক সেই সময়ে যাত্রী উপর থেকে নেমে সেইখানে এসে দাঁড়াল, কর্কশস্বরে বললে, 'এত গোলমাল কিসের শুনি ? রাতটা সৃষ্টি হয়েছে ঘুমোবার জন্যে, চিৎকার করবার জন্যে নয়। এসব আমি সহ্য করব না।' এই বলে সে আবার সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

সকলে সভয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইল ; এমনকি মিসেস্ দাস পর্যন্ত আর উচ্চৈঃস্বরে নিজের মতামত প্রকাশ করতে সাহস করলেন না।

পরদিন শ্রীপুর শহরে ছিল চড়কের উৎসব। রাজপথের আশেপাশে খোলা জমির উপরে মেলা বসেছে। নানা জায়গা থেকে নানা দোকান-পসারী নানান রকম রংচঙে লোভনীয় জিনিস এনে দোকানে সাজিয়ে রেখেছে। নাগরদোলায় চড়ে কোথাও ছেলেমেয়ের দল হাসিখুশিতে হৈ-হুল্লোড় করছে, কোথাও বায়োস্কোপের তাঁবু খাটানো হয়েছে এবং কোথাও বা ম্যাজিক দেখানো হচ্ছে। রাস্তা-ঘাট লোকে লোকারণ্য।

এদিকে স্বাস্থ্যনিবাসের বৈঠকখানায় তখনো সবাই মিলে ঘোঁট পাকিয়ে তুলেছে। মিস্টার দাস এইসব আজে-বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে থানায় খবর দিতে বেরিয়ে গেলেন।

খানিক পরে উপরতলা থেকে কর্কশ কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এল, 'মিসেস্ দাস! মিসেস্ দাস!'

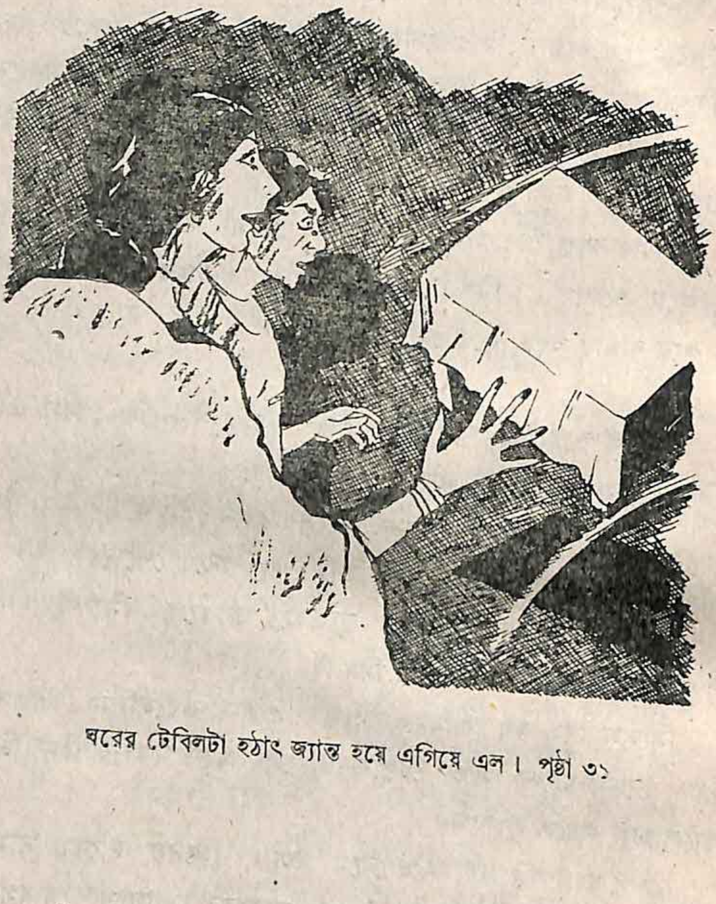
সে-ডাক বৈঠকখানায় মিসেস্ দাসের কানে গেল বটে, কিন্তু তাঁর ভাব-ভঙ্গী দেখে মনে হল না যে, তিনি কিছু শুনতে পেয়েছেন।

কিছুক্ষণ পর যাত্রী আবার ক্রুদ্ধস্বরে হাঁকলে, 'মিসেস্ দাস! শীগগির আমার খাবার পাঠিয়ে দিন।'

মিসেস্ দাস তবু কোনরকম ব্যস্ততা প্রকাশ করলেন না। একমনে তাঁর ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে চেয়ার-টেবিলের অদ্ভুত নৃত্য-কাহিনী নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

এবার যাত্রী নিজেই নিচে নেমে এল। মিসেস্ দাসের সামনে এসে একটা গোল-টেবিলের উপরে সজোরে করাঘাত করে বললে, 'মিসেস্ দাস! আপনি কি মনে করেন, আমি হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকবার জন্যে স্বাস্থ্যনিবাসে এসেছি?'

এইবার মিসেস্ দাস মুখ খুললেন। তিনিও টেবিলের উপরে



ঘরের টেবিলটা হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে এগিয়ে এল। পৃষ্ঠা ৩১

সমান জোরে চড় মেরে বলে উঠলেন, 'আপনি কি মনে করেন, ভূত নামাবার জন্য আপনাকে আমি ঘর ভাড়া দিয়েছি ?'

যাত্রী বললে, 'আপনার এ কথার অর্থ কি ?'

মিসেস্ দাস বললেন, 'আপনার জন্যে আমার বিশ্বাসী টেবিল-চেয়ারগুলো পর্যন্ত আমাকে আর গিন্নী বলে মানে না। নাচবার জন্যে টেবিল-চেয়ার তৈরী করা হয় নি। কে ওদের এমন নাচতে শেখালে ? কে, আপনিই না ? আপনার নাম কি ? আমার ঘরে বসে আপনি কি করেন ? কাল অত রাত্রে বাইরে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ? আর ফিরে এলেনই বা কেমন করে ?'

বিষম রাগে যাত্রীর দেহ থর্থর্ করে কাঁপতে লাগল। হঠাৎ ভীষণ চীৎকার করে সে বলে উঠল, 'চুপ করো। কে আমি ? তোমরা জানতে চাও ? তোমরা দেখতে চাও ? দেখো তবে।' বলেই সে তার মুখের ব্যাণ্ডেজে মারলে এক টান। ব্যাণ্ডেজ, ঠুলি-চশমা, নকল গোঁফ-দাড়ি আর তার নকল নাক সকলের চোখের সামনে খসে পড়ল। সবাই দারুণ আতঙ্কে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে, একটা জামা-কাপড়-পরা মূর্তি পায়ে-পায়ে ক্রমেই এগিয়ে আসছে, কিন্তু সে-মূর্তির কাঁধের উপরে মুখমণ্ডলের কোন চিহ্নই নেই!

বৈঠকখানায় মহা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। চারিদিকে চিৎকার, কান্না, আর্তনাদ! মিসেস্ দাস 'আঁ' বলে চেঁচিয়ে উঠে প্রচণ্ড গতর নিয়ে পালাতে গিয়ে দড়াম করে এক আছাড় খেলেন। কিন্তু সেই অবস্থাতেই আশ্চর্য কৌশলে ফুটবলের মত গড়াতে গড়াতে চোখের নিমেষে তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বাকি লোকগুলিও কে যে কেমন করে কোন্ দিকে সরে পড়ল, কিছুই বোঝা গেল না। আধ মিনিটেই ঘর একেবারে ফাঁকা।

স্কন্ধকাটা মূর্তিটা মিনিটখানেক সেখানে পায়চারি করে আবার ধীরে ধীরে বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

এ খবর শ্রীপুরের পাড়ায়-পাড়ায় রটে যেতে বেশী দেরি লাগল না। চড়কের মেলার কথা সবাই ভুলে গেল। আধঘণ্টার ভিতরে শহরের সমস্ত জনতা স্বাস্থ্যনিবাসের সামনে এসে হাজির হল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে কেবল একই কথাঃ 'জুজু! জুজু! জুজু! স্বাস্থ্যনিবাসে জুজুবুড়ো এসেছে!'

এমন সময়ে দুজন চৌকিদার ও দারোগাকে সঙ্গে করে মিস্টার দাস, রতনবাবু আর মানিকবাবু বিজয়ী বীরের মতন সদর্পে স্বাস্থ্য-নিবাসে এসে ঢুকলেন।

দারোগা শুধোলেন, 'কোথায় সে লোক?'

'এই যে, এই দিকে আসুন।' বলে, মিস্টার দাস সবাইকে নিয়ে যাত্রীর ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন।

সেই স্কন্ধকাটা মূর্তি তখন ঘরের মাঝখানে একখানা চেয়ারের উপরে স্থির হয়ে বসেছিল।

বলা বাহুল্য, প্রথমে সকলেই ঘাবড়ে গেল। মিস্টার দাস, রতন বাবু ও মানিকবাবু তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে, দরকার হলেই পালাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

দারোগা বললেন, 'ওসব ম্যাজিক আমি ঢের দেখেছি। আমার হাতে যখন ওয়ারেণ্ট আছে, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব সবাইকে আমি গ্রেপ্তার করতে পারি।' এই বলে তিনি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন।

স্কন্ধকাটা মূর্তি বললে, 'কে তোমরা? কি চাও।'

দারোগা বললেন, তোমাকে গ্রেপ্তার করবো।'

যাত্রী উঠে দাঁড়াল। দারোগা এক লাফে যাত্রীর কাছে গিয়ে তার দস্তানা-পরা একখানা হাত চেপে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে দস্তানাটা দারোগার হাতে খুলে এল এবং যাত্রীর হাতখানা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু তখন আর কারুর এসব দেখে আশ্চর্য হবার অবকাশ ছিল না। দারোগা ও চৌকিদারেরা সেই

হস্তহীন স্কন্ধকাটা মূর্তিটাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরল।

মুণ্ডহীন মুখ থেকে কাতর শব্দ শোনা গেল, 'ওঃ! বড় লাগছে। তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আত্মসমর্পণ করছি।'

দারোগা ও চৌকিদারেরা যাত্রীকে ছেড়ে দিয়ে তাকে আগলে দাঁড়িয়ে রইল।

দারোগা বললে, 'নাও, এখন হাতকড়ি পর।'

যাত্রী বললে, 'কেন, আমি কি দোষ করেছি? আমি হচ্ছি অদৃশ্য মানুষ। অদৃশ্য হওয়া কি অপরাধ?'

দারোগা টিট্‌কিরি দিয়ে বললেন, 'কি বললে? অদৃশ্য মানুষ? ম্যাজিকে আমি অমন ঢের-ঢের অদৃশ্য মানুষ দেখেছি। আমার সঙ্গে ওসব চালাকি চলবে না।'

যাত্রী বললে, 'আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। এই দেখুন।' বলেই সে নিজের গায়ের আলোয়ানটা চট্‌পট্‌ খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের উপর দিকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপরেই সে পরনের কাপড়খানা খুলতে লাগল।

দারোগা এতক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অবাক হয়ে এইসব কাণ্ড দেখছিলেন। এখন যাত্রীকে কাপড় খোলবার চেষ্টা করতে দেখেই তিনি তার আসল মতলবখানা বুঝতে পেরে বলে উঠলেন, 'এই চৌকিদার! ওকে ভালো করে চেপে ধরে থাক, নইলে কাপড় খুললেই ও একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।'

কিন্তু তার আগেই যাত্রী কাপড়খানা খুলে ফেলে এক লাফে তাদের নাগালের বাইরে গিয়ে পড়ল। তখন দেখা গেল, কেবল জুতো-মোজা-পরা দু'খানা হাঁটু পর্যন্ত পা ঘরময় লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে। পরমুহূর্তে অদৃশ্য মানুষ তার জুতো-মোজাও খুলে ফেললে এবং জুতোর একপাটি মিস্টার দাসের দিকে ও আর একপাটি দারোগার দিকে সজোরে ছুঁড়ে মারলে।

তারপর সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! ঘরের ভিতরে মহা সোরগোল

পড়ে গেল। 'ঐ, ঐদিকে সে গিয়েছে।' 'বাপ্‌রে বাপ্‌, আমায় লাথি মারলে।' 'ব্যাটা আমাকে ঘুষি মেরেছে!' 'এইবারে তাকে ধরেছি।' 'ঐ যাঃ! আবার পালিয়ে গেল।' 'ওরে বাপ্‌রে, গেছিরে!'

অদৃশ্য মানুষ কখন যে কোন্ দিকে যাচ্ছে, কেউ তা দেখতে পাচ্ছে না, মাঝখানে থেকে কিল-চড়-ঘুষি-লাথি খেয়ে প্রত্যেকেরই প্রাণ যায়-যায় হয়ে উঠল। বেদম্ প্রহার খেয়ে দারোগাবাবু তো মেঝের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। রতনবাবুর গোঁফের একপাশ একদম উড়ে গেল এবং মিস্টার দাসের উপর-পাটির তিন-তিনটে দাঁতের আর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

তারপরই প্রথমে ঘরের দরজার কাছে এবং পরমুহূর্তে সিঁড়ির উপরে দুম্-দুম্ শব্দ শুনে সকলেই বুঝতে পারলে, অদৃশ্য মানুষ সে-ঘর থেকে সকলের অগোচরে চলে গেল।

তখন স্বাস্থ্যনিবাসের সামনে যে জনতা এসে জমা হয়েছিল, তার ভিতরে এক ভীষণ বিভীষিকার সাড়া উঠল, 'অদৃশ্য মানুষ রাস্তায় এসেছে!' 'অদৃশ্য মানুষ রাস্তায় এসেছে!' প্রত্যেকেই এই কথা বলতে বলতে মহা ভয়ে পালিয়ে যেতে লাগল।

শহরের বাইরে ছোট্ট একটি নদী পাহাড়ের কোল ঘেঁসে ঝির-ঝির করে বয়ে যাচ্ছে। সেই নদীর ধারে আতাগাছের ছায়ায় এক খানি পাথর-আসনে বসে শ্রীপুরের মহাকবি অবলাকান্ত একমনে কবিতা রচনা করছিলেন।

অবলাকান্ত হঠাৎ চমকে উঠলেন! ঠিক তাঁর পাশেই ফ্যাঁচ্ করে কে যেন হেঁচে ফেললে। অবলাকান্ত একবার সামনে, একবার পিছনে, একবার ডাইনে ও একবার বামে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে দেখলেন, কিন্তু হাঁচির মালিকের একগাছা টিকিও দেখা গেল না।

অবলাকান্ত ক্যাবলাকান্তের মতন তাকিয়ে আছেন, এমন সময়ে ঠিক তাঁর কাছ থেকে হাত-চারেক তফাতেই আবার কে ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ-

ফ্যাচ করে তিন-তিনবার হেঁচে উঠল।

অবলাকান্তের মুখখানি সাদা হয়ে গেল। বিড়বিড় করে তিনি বললেন, 'কে হাঁচে? আকাশ, বাতাস, না পাহাড়? না যক্ষ, রক্ষ দেবতা, দানব? এ রকম হাঁচি তো ভালো নয়?' এই বলে তিনি তাড়াতাড়ি কবিতার খাতা মুড়ে ফেলে শ্রীপুরের দিকে দ্রুত পদ-চালনা করলেন।

॥ বাবু বংশীবদন বসু ॥ আট

কেউ তাঁকে নাম জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, 'আমার নাম বাবু বংশীবদন বসু।' পাছে তিনি আমাদের উপরে রাগ করেন, সেইজন্য আমরাও তাঁকে বংশীবাবু বলেই ডাকব।

বংশীবাবুর ভোজন হয় যত্র-তত্র, আর শয়ন হয় হট্টমন্দিরে, তারপরে যে সময়টুকু হাতে থাকে, হাটে-ঘাটে-মাঠে টো-টো করে ঘুরে, বংশীবাবু সে-সময়টুকু কাটিয়ে দিতে পারেন অনায়াসেই।

মস্ত মাঠ। একটা বটগাছের ছায়ায় নরম ঘাসের উপরে বংশী-বাবু দু'পা ছড়িয়ে বসেছিলেন। তাঁর সামনেই সাজানো ছিল সারি-সারি চার জোড়া ছেঁড়া জুতোর পাটি। বংশীবাবুর সম্প্রতি পায়ের জুতোর অভাব হয়েছে। কিন্তু সে-অভাব পূরণ করতে তাঁর বেশীক্ষণ লাগে নি। শহরের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে এই চার জোড়া ছেঁড়া জুতো তিনি আজ সংগ্রহ করে এনেছেন। তারপর এখন বসে-বসে পরীক্ষা করছেন, এই চার জোড়া জুতোর মধ্যে কোন্ জোড়া সবচেয়ে ছেঁড়া!

হঠাৎ কে পিছন থেকে বললে, 'ওগুলো জুতো বুঝি?'

বংশীবাবু পিছনে না তাকিয়েই বললেন, 'হ্যাঁ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এগুলি হচ্ছে দাতব্য-জুতো। এর চেয়ে খারাপ চার জোড়া জুতো দুনিয়াতে কেউ আবিষ্কার করতে পারবে না।'

পিছনের লোকটি বললে, 'হুঁ।'

বংশীবাবু বললেন, 'অবশ্য এর চেয়েও খারাপ জুতো যে আমি পারিনি তা নয়, কিন্তু তবু সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, এ শহরে যারা জুতো দান করে তারা খুব দয়ালু লোক নয়।'

পিছনের লোকটি বললে, 'দুনিয়ায় যারা সবচেয়ে পাজী লোক, এ শহরে বাস করে তারাই।'

কে এতটা কথা বলছে দেখবার জন্যে বংশীবাবু ডান-কাঁধের উপরে মুখ ফিরিয়ে পিছন পানে তাকালেন। সেদিকে কেউ নেই। তারপর তিনি বাঁ-কাঁধের উপরে মুখ ফিরিয়ে পিছন পানে তাকালেন। সেদিকেও কেউ নেই। তারপর তিনি একেবারে ঘুরে বসলেন। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। বংশীবাবু নিজের মনে বললেন, 'আমি কি জেগে-জেগেই স্বপ্ন দেখছি?'

সেই কণ্ঠস্বর বললে, 'ভয় পেও না।'

বংশীবাবু আঁতকে উঠে বললেন, 'কে তুমি বাবা? কোথায় তুমি? কেউ কি তোমাকে মাটির ভেতরে পুঁতে রেখে গিয়েছে?'

কণ্ঠস্বর আবার বললে, 'ভয় পেও না।'

হতভম্ব বংশীবাবু বললেন, 'বলো কি বাবা, ভয় পাবো না কি রকম? উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সব খাঁ-খাঁ করছে। এই তেপান্তরে আমি একলা বসে আছি। অথচ এখানে এসে তুমি কথা কইছো কোন্‌খান থেকে? ...না, তুমি বোধহয় নেই। কাল রাতে সিদ্ধি খেয়েছিলুম, এখনো নেশা কাটে নি। ভুল শুনছি।'

কণ্ঠস্বর বললে, 'না, এ নেশা নয়।'

'বাপ্‌রে!' বলেই এক লাফে বংশীবাবু উঠে দাঁড়ালেন। একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে পিছু হট্‌তে হট্‌তে বললেন, 'না, নিশ্চয়ই আমার নেশা কাটে নি! দিব্যিগেলে বলতে পারি, আমি এখুনি কার গলা শুনলুম!'

কণ্ঠস্বর বললে, 'হ্যাঁ, তুমি আমারই গলার আওয়াজ শুনেছ।'

ভয়ে দুই চোখ বন্ধ করে বংশীবাবু বললেন, 'আর কখনো আমি সিদ্ধি খাবো না।'

হঠাৎ কে তাঁর দুই কাঁধ ধরে খুব খানিকটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'তুমি একটা মস্ত গাধা।'

বংশীবাবু চোখ না খুলেই বললেন, 'আমি গাধা হতেও রাজী আছি বাবা, তুমি যদি দয়া করে চুপ করো। এখন যদি রাত হত তাহলে এসব ভূতেরই খেলা বলে মনে করতাম।'

কণ্ঠস্বর বললে, 'ওহে বোকারাম! আমি ভূত-টুত কিছু নই, আমি হচ্ছি অদৃশ্য মানুষ!'

বংশীবাবু চোখ খুলে বললেন, 'অদৃশ্য মানুষ না নেশার খেয়াল?'

কণ্ঠস্বর বললে, 'নেশার খেয়াল নয়, আমি হচ্ছি অদৃশ্য মানুষ।'

'তুমি যে অদৃশ্য সেটা আমি বুঝতেই পারছি বাবা! কিন্তু তুমি কোন্ মন্ত্রে অদৃশ্য হয়েছ, সেটা আমাকে শিখিয়ে দিতে পারো?'

'পারি, যদি তুমি আমার কথা শোনো।'

'ও-মন্ত্র পেলে তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি।'

'দেখো, আমিও তোমার মতন ভবঘুরে, আমি অসহায়। আমার মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই। সারাদিন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলছে। মানুষ পেলেই এখুনি আমি খুন করতে পারি।'

'বাবা!' বলেই বংশীবাবু পালিয়ে যাবার উপক্রম করলেন।

খপ্ করে বংশীবাবুর একখানা হাত ধরে অদৃশ্য মানুষ বললে, 'তোমার কোন অনিষ্টই আমি করব না। আমি জামা-কাপড় চাই, আশ্রয় চাই, খোরাক চাই। এইসব বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য করবে।'

বংশীবাবু ভাবতে লাগলেন, যার নিজের পরনের কাপড়, পেটের অন্ন, আর মাথা গোঁজবার ঠাঁই জোটে না, এইসব বিষয়ে সে কিনা সাহায্য করবে অপরকে। কিন্তু ভয়ে মনের কথা তিনি মুখ ফুটে

বলতে পারলেন না।

কণ্ঠস্বর বললে, 'আমি হচ্ছি অদৃশ্য মানুষ···সমস্ত পৃথিবীকে আমি শাসন করতে পারি। আমাকে সাহায্য করলে তোমার কোন অভাবই থাকবে না। কিন্তু সাবধান, আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে পৃথিবীতে কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।' বলতে বলতে সে তার অদৃশ্য দুই হাত দিয়ে বংশীবাবুর দু'খানা হাত সজোরে চেপে ধরলে।

বংশীবাবু যাতনায় চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'ছেড়ে দাও বাবা, আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকব।'

নোট-প্রজাপতি ॥ নয়

শ্রীপুরের স্বাস্থ্যনিবাসে সকালে-বিকালে চা, টোষ্ট, কেক, বিস্কুট ও ডিম প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। শ্রীপুরের যে-কোন ভদ্রলোকই কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করলে সেখানে গিয়ে চায়ের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারতেন। সেজন্য প্রতিদিন সকালে-বিকালে সেখানে চায়ের তেষ্টা মেটাবার জন্যে অনেক তৃষিত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটত।

যাত্রীর অন্তর্ধানের পরের দিন সকালেও স্বাস্থ্যনিবাসের চা-বিভাগে চা-ভক্তদের অভাব হল না।

একটা মস্ত গোলাকার টেবিলের চারিধারে বসে খরিদ্দাররা মাঝে মাঝে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন এবং গতকল্যকার ঘটনা নিয়ে উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছেন। বলা বাহুল্য, চা-সভার সভাপতি ছিলেন স্বাস্থ্যনিবাসের মালিক মিস্টার দাস স্বয়ং এবং তাঁর ডাইনে ও বামে বিরাজ করছিলেন রতনবাবু ও মানিকবাবু। আসল বক্তা হচ্ছেন তাঁরা তিনজনেই, বাকি সবাই শ্রোতা ও উৎসাহদাতা।

বক্তৃতা যখন রীতিমত জমে উঠেছে, তখন ঘরের ভিতরে প্রবেশ

করলেন একটি নূতন লোক। তাঁর জামা-কাপড় যে হপ্তা কয়েকের মধ্যে রজকের দেখা পায় নি, এ সত্য খুব সহজেই বোঝা যায়। তাঁর ধূলি-ধূসর তালিমারা জুতো দুখানির অবস্থাও সন্দেহজনক। কারণ তাদের ভিতরে ভদ্রলোকের পা-দুখানি ঢুকেও আরো খানিকটা বেওয়ারিশ জায়গা খালি পড়ে আছে। ভদ্রলোক আসতে আসতে ক্রমাগত পিছন পানে চেয়ে চমকে উঠেছেন, যেন তাঁর পিছনে পিছনে আসছে কোন অদৃশ্য বিপদ!

স্বাস্থ্যনিবাসের খরিদ্দারের এমনধারা হতচ্ছারা চেহারা মিস্টার দাস পছন্দ করলেন না। তিনি একটু বিরক্তভাবেই বললেন, 'এখানে আপনার কি দরকার?'

আগন্তুক বললেন, 'এক পেয়ালা চা আর দু-টুকরো রুটি চাই। গোটা দুয়েক ডিম হলে আরো ভালো হয়।'

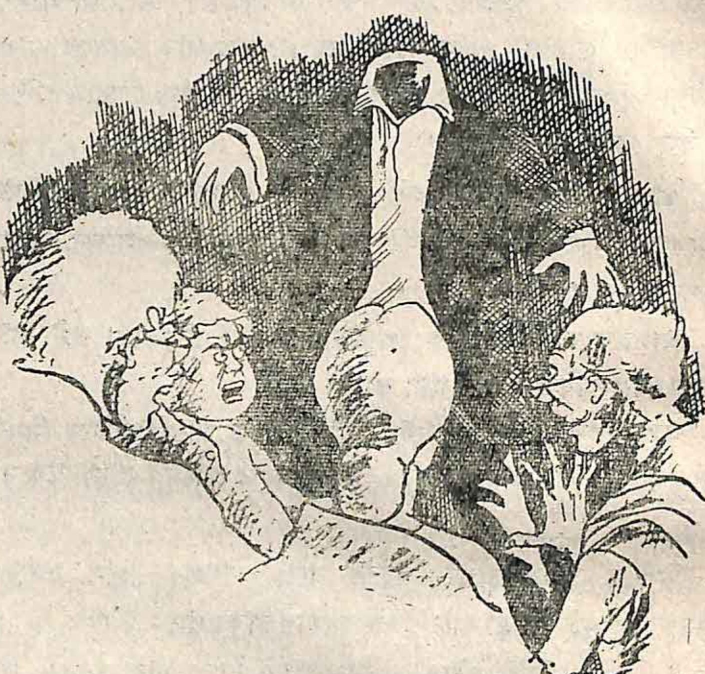
আগন্তুকের ছেঁড়া পকেটের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে মিস্টার দাস বললেন, 'দাম চার আনা। কিন্তু খাবার আগেই আপনাকে দাম দিতে হবে।'

মিস্টার দাসের ভয়ের কারণ বুঝে আগন্তুক হেসে বললেন, 'আমার পকেট ছেঁড়া বটে, কিন্তু আমার টাকা থাকে ট্যাঁকে। এই নিন।' বলে তিনি ট্যাঁক থেকে একটা টাকা বার করে ঠং করে টেবিলের উপরে ফেলে দিলেন।

মিস্টার দাস অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'আসুন, আসুন, ঐ টেবিলের ধারে বসুন। আপনার খাবার এখুনি আসবে।' বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন, 'আসুন ডাক্তারবাবু, এইবার সেই ভূতুড়ে লোকটার ঘরে যাওয়া যাক।'

মিস্টার দাসের সঙ্গে মানিকবাবু স্বাস্থ্যনিবাসের ভিতর দিকে চলে গেলেন।

আগন্তুক টেবিলের ধারে গিয়ে বসলেন। কারুকে বোধ হয় বলে



কে আমি ? তোমরা জানতে চাও দেখো তবে ।' পৃষ্ঠা ৩৫

দিতে হবে না যে, এই আগন্তুকই হচ্ছেন আমাদের সেই বংশীবাবু।

মিস্টার দাস ও মানিকবাবু যাত্রীর ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখলেন, কালকের সেই তুমুল কাণ্ডের পর ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ঠিক সেই ভাবেই এলোমেলো হয়ে ছড়ানো রয়েছে। আর রয়েছে ওল্টানো চেয়ার-টেবিল, ভাঙাচোরা শিশি-বোতল ও লণ্ডভণ্ড বিছানা। কেবল যাত্রীর জামা-কাপড়, ব্যাণ্ডেজ, চশমা ও নকল নাকটা দারোগাবাবু যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

ঘরের কোণে একখানা পকেট-বুক পড়েছিল। সেইখানা তুলে নিয়ে মিস্টার দাস বললেন, 'এই পকেট-বুকখানার পাতা ওল্টালে লোকটার অনেক কথাই হয়তো জানা যাবে।'

মানিকবাবু কি জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ঘরের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল।

মিস্টার দাস চমকে উঠে বললেন, 'ওকি! দরজা খুললে কে?'

মানিকবাবু দরজার দিকে চেয়ে খুব সহজভাবেই বললেন, 'বোধহয় হাওয়ায় দরজাটা খুলে গেল। এতে ভয় পাবার কিছুই নেই।'

মিস্টার দাস বললেন, কালকের ঘটনার পর থেকে অমনভাবে দরজা খুলে গেলেই আমার বুকটা ধড়াস করে ওঠে।'

এই সময় ঘরের ভিতর একটা চাপা হাঁচির শব্দ শোনা গেল।

মিস্টার দাস বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আপনি এখুনি হাঁচলেন?'

ঘরের মধ্যে গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'না, আমি হেঁচেছি। আমাকে আপনারা চেনেন।'

মিস্টার দাস ও মানিকবাবু হতাশভাবে মড়ার মতন ফ্যাকাশে মুখে দুদিকে সরে গিয়ে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়ালেন।

কণ্ঠস্বর বললে, 'মিস্টার দাস, আমার পকেট-বুক আপনার হাতে কেন? দিন, ফিরিয়ে দিন!'

মিস্টার দাস কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এসে পকেট-বুকখানা

সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

পকেট-বুকখানা মিস্টার দাসের হাত থেকে বেড়িয়ে শূন্যে উড়ে একখানা চেয়ারের উপর গিয়ে পড়ল।

কণ্ঠস্বর বললে, 'মিস্টার দাস, আমার জামা-কাপড়গুলো কোথায় গেল ?'

মিস্টার দাস বললেন, 'পুলিশ নিয়ে গেছে।'

কণ্ঠস্বর বললে, 'আমার আর জামা-কাপড় নেই। তবে আপাতত আপনার জামা-কাপড় পেলেই আমার চলে যাবে। আপনার গায়ের আলোয়ানখানা খুলে মেঝের ওপরে রাখুন। তারপর আপনার জামা-কাপড় আর জুতো সব খুলে ঐ আলোয়ানের ভেতর রেখে দিন।...আর হ্যাঁ, একটা পোঁটলা বেঁধে জিনিসগুলো আমার হাতে দিন।'

মিস্টার দাস আঁতকে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ, সে কি কথা !'

কণ্ঠস্বর খুব কর্কশভাবে বললে, 'যা বলছি তাই করুন। দেখতে পাচ্ছেন, আমি অদৃশ্য। আমি যদি ইচ্ছা করি, তাহলে এখুনি আপনাদের দুজনকে গলা-টিপে মেরে ফেলতে পারি।'

মিস্টার দাস বাধো-বাধো গলায় অত্যন্ত লজ্জিতভাবে বললেন, 'কিন্তু এ ঘরে ডাক্তারবাবুর সামনে আমি জামা-কাপড় খুলব কেমন করে ?'

কণ্ঠস্বর বললে, 'আমি অদৃশ্য বটে, কিন্তু আপনাদের চেয়ে বোকা নই। একবার চোখের আড়ালে যেতে পারলেই আপনি যে এখুনি পুলিশে খবর দিতে ছুটবেন, সেটা আমি বেশ বুঝতে পারছি। ও চালাকি চলবে না। যা বলছি তাই করুন। আর মানিকবাবু, ঐ বইগুলো গুছিয়ে তুলে আপনিও এই পোঁটলার ভেতরে রেখে দেবার চেষ্টা করুন।'

বাইরে তখন বংশীবাবুর চা, রুটি ও ডবল ডিম শেষ হয়ে গেছে।

এমন সময় রতনবাবু শুনতে পেলেন, যাত্রীর ঘর থেকে যেন একটা গোলমালের আভাস আসছে। দিনকাল ভালো নয় বলে তিনিও তাড়াতাড়ি উঠে ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হলেন।

সিঁড়ির সামনে এসেই তিনি শুনলেন, তাঁর খুব কাছে একটা হাঁচির শব্দ হল। এ হাঁচি তিনি ভোলেন নি। শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি একপাশে সরে দাঁড়ালেন। তারপরেই দেখলেন, সিঁড়ির উপর থেকে একটা পোঁটলা শূন্যে দুলতে দুলতে নেমে আসছে।

পোঁটলাটা ঠিক যেন হাওয়ায় সাঁতার কাটতে কাটতে বৈঠকখানা ঘরের দিকে চলে গেল।

ঠিক সেই সময় মিসেস্ দাস কি একটা কাজের জন্য বৈঠকখানা ঘরের দিকে আসছিলেন। কিন্তু দূর থেকে উড্ডীয়মান পোঁটলাটা দেখে তাঁর চক্ষুস্থির এবং পা-দুটো অচল হয়ে গেল। এরপরেই বাইরের ঘর থেকে একটা গোলমালের শব্দ ভেসে এল।

সঙ্গে সঙ্গে মানিকবাবু যাত্রীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে উঠলেন, 'অদৃশ্য মানুষ! অদৃশ্য মানুষ! ধরো···যতক্ষণ ওর হাতে পোঁটলা থাকবে সবাই মিলে অনায়াসেই ওকে ধরতে পারবে।'

রতনবাবু বেগে বৈঠকখানায় প্রবেশ করে দেখলেন, বংশীবাবু পোঁটলাটা কাঁধে করে দ্রুতপদে স্বাস্থ্যনিবাস থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছেন। অদৃশ্য মানুষ নির্বোধ নয়, নিজে পোঁটলা নিয়ে যেতে গেলে যে বিপদের সম্ভাবনা আছে, সেটা সে বিলক্ষণই জানে। তাই বংশী-বাবুকেই সে পোঁটলার বাহন করেছে।

রতনবাবুও বংশীবাবুর পিছনে ছুটতে ছুটতে চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'চোর! চোর! পোঁটলা নিয়ে পালাচ্ছে! পাকড়াও, পাকড়াও।'

বেচারী বংশীবাবু! খানিক পরেই তিনি দেখলেন, সারা শ্রীপুর শহরটাই যেন তাঁর পিছনে ভেঙে পড়েছে। সকলেরই মুখে এক

কথা ঃ চোর! চোর! পোঁটলা--চোর! ধরো ওকে, মারো ওকে।'

এসব আপত্তিকর কথা শুনে বংশীবাবু আরো জোরে পা চালিয়ে দিলেন। তাঁর ছোটবার অসুবিধা হবে বলে তাঁর দাতব্য-জুতো-জোড়াকেও তিনি পা থেকে খুলে নির্দয়ভাবে বিসর্জন দিতে বাধ্য হলেন।

সকলের আগে আসছিলেন রতনবাবু ও মানিকবাবু। হঠাৎ রতনবাবুর মনে হল, কে যেন তাঁকে বিশ্রী একটা ল্যাং মারলে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুখ থুবড়ে পড়ে দু'হাতে মাটি আঁকড়ে ধরলেন।

তারপরই বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতন মানিকবাবুর টিকলো নাকের উপরে প্রচণ্ড একটা ঘুষি এসে পড়ল। মানিকবাবু দুই চক্ষে অনেকগুলো সর্ষের ফুল দেখলেন এবং তারপর কি যে হল তা আর তিনি বলতে পারেন না।

আর যারা ছুটে আসছিল, তাদেরও কেউ খেলে কিল, কেউ খেলে চড় এবং কেউ-বা খেলে লাথি বা গলাধাক্কা! বেগে ছুটতে ছুটতে আছাড় খেয়ে অনেকেরই হাত-পা ভাঙল, মাথা ফাটল! বাকি লোকগুলি তখন বুদ্ধিমানের মত যে যেদিকে পারলে চিৎকার করতে করতে পলায়ন করল, 'অদৃশ্য মানুষ। অদৃশ্য মানুষ! অদৃশ্য মানুষ আবার ফিরে এসেছে! সকলে সাবধান হও।'

এই ভয়ানক খবর শুনেই অনেকে নিজের নিজের বাড়ির সদর দরজায় ভিতর থেকে খিল লাগিয়ে দিল।

শ্রীপুরের সবাই যখন রাজপথে, মিস্টার দাস তখন যাত্রীর ঘরের ভিতরে বন্দী হয়ে আছেন। রাজপথের ও স্বাস্থ্যনিবাসের সমস্ত কোলাহল ও আর্তনাদ তাঁর কানে এসে ঢুকছে, কিন্তু মিস্টার দাসের ঘর থেকে বেরুবার উপায় নেই, কারণ তখন তিনি সদ্যপ্রসূত শিশুর মতই বস্ত্রহীন। অবশেষে অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি যখন খানকয়েক খবরের কাগজ তুলে নিয়ে কোমরে জড়িয়ে নিজের বস্ত্রের অভাব দূর

করবার চেষ্টা করছেন, তখন রতনবাবু আবার হাপরের মতন হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলেন। ঘরে ঢুকেই রতনবাবু বলে উঠলেন, 'অদৃশ্য মানুষ! অদৃশ্য ঘুষি! অদৃশ্য লাথি! সমস্ত শ্রীপুরের গতর চূর্ণ হয়ে গেছে।'

মিস্টার দাস ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে এখন কোথায়?'

'এতক্ষণ আমরা তার পিছনে পিছনে ছুটছিলুম, কিন্তু এখন আমাদেরই পিছনে পিছনে সে ছুটে আসছে। হাতের কাছে যাকেই পাচ্ছে মেরে তার হাড় গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। সবাই এখন পালিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে···অদৃশ্য মানুষ বোধহয় পাগল হয়ে গেছে!'

ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে মিস্টার দাস বললেন, 'সে আবার এখানে ফিরে আসবে না তো?'

'আসবে না মানে, ঐ এল বুঝি!' এই বলেই সাঁতারুরা গঙ্গায় যেমন করে ঝাঁপ দেয়, রতনবাবু তেমনি করেই মাটির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে একেবারে খাটের তলায় ঢুকে অদৃশ্য মানুষের চেয়েও অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মিস্টার দাসও কোমরের খবরের কাগজগুলোকে দুই হাতে প্রাণপণে চেপে ধরে দরজার বাইরের দিকে সুদীর্ঘ একটি লম্ফ দিলেন, এবং এর ফলে তিনি যে কোথায় গিয়ে পড়লেন তা আমরা জানি না, তবে তাঁকে আর দেখা গেল না!

সারাদিন ধরে শ্রীপুর শহরে যেসব অঘটন ঘটল, চতুর্মুখ ব্রহ্মা চার মুখেও তা বলে শেষ করতে পারবেন না।

রাজপথে কেউ হাঁচলেই চারিদিকে অমন সাড়া ওঠে, 'ঐ অদৃশ্য মানুষ এসেছে।' সঙ্গে সঙ্গে সেখানটা মরুভূমির মতন জনশূন্য হয়ে যায়। বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে থেকেও শান্তি নেই। হাওয়ার দাপটে ঘরের দরজা-জানলা যদি হঠাৎ খুলে বা বন্ধ হয়ে যায়, অমনি সবাই হাঁউ-মাঁউ করে চেঁচিয়ে ওঠে।

শ্রীপুর ব্যাঙ্কের 'কাউন্টারে'র উপর হাজার কয়েক টাকার নোট নিয়ে একজন কেরানী হিসাব করছিল। আশেপাশে আরো অনেক লোক আপন-আপন কাজে নিযুক্ত ছিল। এমন সময় দেখা গেল, সকলের চোখের স্মুখ দিয়েই নোটের তাড়া ঠিক প্রজাপতির মতন শূন্যপথে উড়ে গেল। সবাই রাজপথে ছুটে এল, কিন্তু কেউই সেই নোট-প্রজাপতিদের আর কোন সন্ধান পেলে না। কেবল দেখা গেল, একজন ময়লা জামা-কাপড-পরা লোক খালি পায়ে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্যনিবাসের উপরে অদৃশ্য মানুষের আক্রোশ অত্যন্ত বেশী কারণ, সারাদিনে সে বার-চারেক স্বাস্থ্যনিবাসকে আক্রমণ করেছে, সেখানকার একখানা সার্সির কাঁচও অটুট নেই, এবং কাঁচের সমস্ত বাসনপত্রও ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। স্বাস্থ্যনিবাসের ভাড়াটিয়ারা প্রত্যেকেই পলায়ন করেছে।

খবরের কাগজে এইসব ঘটনার উজ্জ্বল বর্ণনা পাঠ করে শ্রীপুরের বাসিন্দাদের উত্তেজনা, দুর্ভাবনা ও বিভীষিকার আর সীমা রইল না। কখন, কোথায় এই ভীষণ অদৃশ্য মানুষের অদৃশ্য আবির্ভাব ঘটবে, সেই দুশ্চিন্তায় সকলেই তটস্থ হয়ে রইল।

যে মাঠে বংশীবাবুর সঙ্গে প্রথমে আমাদের চেনাশুনো হয়, সেই ধূ-ধূ মাঠেরই এক নির্জন কোণে একটা ঝোপের ভিতরে তিনি এখন আবার হতাশভাবে দু-পা ছড়িয়ে বসে ঘন-ঘন হাঁপ ছাড়ছেন। মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে কেন যে তিনি শিউরে উঠছেন, অন্য কেউ তার এ-রহস্য বুঝতে পারবে না।

হঠাৎ শূন্যপথে দৈববাণীর মত এক কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল, 'বংশীবদন, তোমার হাঁপ ছাড়া শেষ হল কি? সন্ধ্যে হতে যে আর দেরি নেই।'

বংশীবাবুর বদনে কিছুমাত্র উৎসাহের লক্ষণ দেখা গেল না। অত্যন্ত কাহিল ভাবে তিনি বললেন, 'আপনার দুটি পায়ে পড়ি,

আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন।'

কণ্ঠস্বর বললে, 'সে কি হে বংশীবদন! ব্যাঙ্কের 'কাউণ্টার' থেকে, রাস্তার লোকের পকেট থেকে আজ কত নোট আর টাকা তোমার পকেটে এসেছে সেটা হিসেব করে দেখেছ কি? আমার সঙ্গে থাকলে রোজই এমনি আশ্চর্য রোজগার হবে। এর অর্ধেক তোমার, আর অর্ধেক আমার।'

বংশীবাবু দুই হাত জোর করে কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'আমার আশ্চর্য রোজগারে আর কাজ নেই বাবা। এত রোজগার আমার ধাতে সইবে না। এর চেয়ে গড়ের মাঠের মতন ট্যাঁক নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়ানো ঢের ভালো। রোজগার করে করব কি, সারা শহর যে আমাকে চিনে ফেলেছে। পথে-পথে পাহারাওয়ালা ঘুরছে আমার গলা টিপে ধরবার জন্যে। অপনি তো অদৃশ্য হয়ে দিব্যি মজায় আছেন, কিন্তু আমার? আমার কি হবে? হায়, হায়, হায়। এতদিন পরে শ্রীপুর বুঝি ছাড়তে হল।'

কণ্ঠস্বর বললে, 'তাহলে চল বংশীবদন, আমরা অন্য শহরে চলে যাই।'

বংশীবাবু চমকে উঠে বললেন, 'বলেন কি মশাই? এই একদিনেই সারা শহরে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ছুটোছুটি করে আমার জিভ বেড়িয়ে পড়েছে। এরপরও আবার আপনার অন্য শহরে যাবার ইচ্ছে আছে নাকি? কিন্তু অন্য শহরে গিয়ে কি হবে? আপনি যদি দয়া করে আমার ঘাড় থেকে না নামেন, তাহলে সেখানেও তো আমি একদিনেই বিখ্যাত হয়ে পড়ব। শেষটা ধরা পড়ব আমি, আর আপনি তো হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে যাবেন।'

কণ্ঠস্বর বললে, 'আরে ছ্যাঃ, তুমি দেখছি একটা বাজেমার্কা বন্ধু।'

বংশীবাবু সায় দিয়ে দুঃখিতভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'তার চেয়েও খারাপ মশাই, তার চেয়েও খারাপ। আমি হচ্ছি একেবারে

রাবিশ-মার্কা বন্ধু! এতক্ষণে এইটুকু যদি বুঝে থাকেন, তাহলে আর কেন, আমাকে রেহাই দিন না?'

আচম্বিতে বংশীবাবুর দেহটা ঝাঁকানি খেয়ে উপরে উঠে শূন্যে দুলতে লাগল, যেন কোন অদেখা হাত গলা ধরে তাঁকে টেনে তুলেছে। বংশীবাবু কেঁদে ফেলে বললেন, 'হুজুর, আমি আপনার গোলাম! যা বলবেন তাই করব।'

সেইদিনই রাতদুপুরে শ্রীপুরের এক পুলিশ-ফাঁড়িতে বেজায় হৈ-চৈ পড়ে গেছে।

ফাঁড়ির পাহারাওয়ালা ফটকের সামনে বসে-বসে ঢুলছে, হঠাৎ কোত্থেকে একটা লোক এসে দড়াম করে তার পায়ের তলায় আছড়ে পড়ল এবং চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে উঠল, 'বাঁচাও, বাঁচাও! অদৃশ্য মানুষ!'

সে-চিৎকারে কবরের মড়া পর্যন্ত জেগে ওঠে, ঘুমন্ত পাহারাওয়ালা তো সামান্য ব্যক্তি···তার উপরে আবার অদৃশ্য মানুষের নাম!

পাহাড়াওয়ালা মস্ত এক লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'কৈ, কোথায় সে?'

লোকটা বললে, 'কেমন করে তাকে দেখিয়ে দেব? সে যে অদৃশ্য মানুষ! সে আমার পিছনে পিছনে তেড়ে আসছে। আমাকে বাঁচাও।'

হঠাৎ পাহারাওয়ালার দাড়ি-ভরা গালে চটাস করে এক নিরেট চর এসে পড়ল। গালে হাত বুলোতে বুলোতে হতভম্ব পাহারাওয়ালা দু-পা পিছিয়ে এল। তারপরেই সবিস্ময়ে দেখলে, তার সামনের লোকটাকে কে যেন হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কে যে নিয়ে যাচ্ছে তা দেখবার জো নেই।

পাহারাওয়ালা এক লাফ মেরে এগিয়ে গিয়ে দু-হাতে লোকটার দুই পা খুব জোরে চেপে ধরলে, তারপর সেই হতভাগ্য লোকটার দেহ

নিয়ে একদিকে পাহারাওয়ালা আর একদিকে অদৃশ্য মানুষ, এই দুয়ে মিলে 'টাগ-অফ্‌ওয়ার' লেগে গেল।

গোলমাল শুনে ফাঁড়ির দারোগা বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, 'এসব কি কাণ্ড?'

পাহারাওয়ালা টানাটানি করতে করতে প্রায় অবরুদ্ধস্বরে বলে উঠল, 'অদৃশ্য মানুষ!'

যার দেহ নিয়ে টানাটানি করা হচ্ছে সেই লোকটি অর্থাৎ আমাদের বংশীবাবু যাতনায় বিকৃতস্বরে বলে উঠলেন, 'আমাকে বাঁচান! আমার দেহ এবার ছিঁড়ে দু'খানা হয়ে যাবে।'

দারোগা রিভলবার বার করে কয়েকবার গুলিবৃষ্টি করলেন। গুলি অদৃশ্য মানুষের গায়ে লাগল কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু বংশী-বাবুর দুই হাত থেকে অদৃশ্য মানুষের হাতের বাঁধন ফস করে খুলে গেল।

পূর্ণ-বিধু সংবাদ ॥ দশ

রসায়নশাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীপুর শহরে বাস করতেন। আজ সারাদিন তাঁর অশান্তির অবধি নেই।

আজ সারাদিন শ্রীপুরের পথে হট্টগোল ও হুড়োহুড়ি চলেছে, তার জন্য পূর্ণবাবুর সমস্ত কাজ-কর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। সারাদিনই তাঁর কানের ভিতরে এই চিৎকারই বারবার ছুটে এসেছে, 'অদৃশ্য মানুষ! অদৃশ্য মানুষ! অদৃশ্য মানুষ ঐ আসছে! ঐ ধরলে!'

পূর্ণবাবুও বারবার বিরক্তিভরে নিজের মনেই বলছেন, 'পৃথিবীতে আবার কি রূপকথার রাজ্য ফিরে এল? অদৃশ্য মানুষ! সারা দুনিয়াটা কি হঠাৎ পাগল হয়ে গেল?'

সন্ধ্যার পরে শহর যখন ঠাণ্ডা হল ও রাজপথের জনতা কমে গেল, পূর্ণবাবু তখন নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের কাজে বসলেন। রাত যখন দুপুর, তখনো তিনি কাজ করছেন একমনে।

আচমকা কতকগুলো কি ভাসা-ভাসা চিংকার ও রিভলবারের শব্দ তাঁর কানে এসে ঢুকল। কাজ করতে করতে মুখ তুলে পূর্ণবাবু বললেন, 'আবার কি গাঁজাখোরদের উপদ্রব শুরু হল? কিন্তু রিভলবার ছুঁড়ছে কে? তারপর আবার তিনি নিজের কাজে মন দিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই খুব জোরে তাঁর সদর দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ হল। তারপর দরজা খোলার ও বন্ধ হওয়ার আওয়াজ ভেসে এল তাঁর কানে।

চাকরকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ক কড়া নাড়ছিল?'

চাকর বললে, 'জানি না হুজুর! দরজা খুলে কারুকে তো দেখতে পেলুম না।'

চাকর চলে গেল, পূর্ণবাবু আবার কাজ করতে লাগলেন।

রাত দুটোর সময় তাঁর কাজ শেষ হল। ধীরে ধীরে টেবিলের ধার থেকে উঠে তিনি তাঁর শয়ন-ঘরে প্রবেশ করলেন।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই একখানা চেয়ারের তলায় কি একটা দাগ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, খানিকটা রক্ত! আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, এখানে রক্তের দাগ এল কেমন করে?

কিন্তু একটানা পরিশ্রমের পর তাঁর চোখ তখন ঘুমে জড়িয়ে আসছিল, এসব বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তিনি শয্যার দিকে অগ্রসর হলেন। ঘুমের ঘোরে সে রাত্রে তিনি ক্ষুধার কথাও ভুলে গেলেন।

কিন্তু খাটের কাছে গিয়ে তিনি যা দেখলেন, তাতে তাঁর বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। তাঁর সমস্ত শয্যা লণ্ডভণ্ড ও বিছানার চাদর ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে এবং তাতেও রক্ত লেগে রয়েছে! এ কী রহস্য!

অবাক হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'কি আশ্চর্য! এ যে পূর্ণ!'

পূর্ণবাবু একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, ঘরে তিনি ছাড়া আর জনপ্রাণী নেই, অথচ কণ্ঠহীন কণ্ঠস্বর! শ্রীপুরের পাগলামি তাঁকেও আক্রমণ করল নাকি? ধেৎ!

হঠাৎ একখানা চেয়ারের দিকে তাঁর নজর পড়ল। চেয়ার থেকে ঠিক আধ হাত উপরে শূন্যে একটা ব্যাণ্ডেজ স্থির হয়ে আছে, আর তাতেও রক্তের দাগ। গোল ব্যাণ্ডেজ, কিন্তু তার ভিতরে কোন বস্তু বা দেহের কোন অংশ নেই! এও কি সম্ভব? পূর্ণবাবুর কিছুমাত্র কুসংস্কার ছিল না, কিন্তু এ-দৃশ্য দেখবার পর তাঁরও বুকের ভিতরটা ছমছম করতে লাগল। ঘরের ভিতর আবার কে তাঁকে ডেকে বললে, 'পূর্ণ! তুমি এখানে!'

বিপুল বিস্ময়ে পূর্ণবাবু হাঁ করে রইলেন!

কণ্ঠস্বর বললে, 'পূর্ণ, ভয় পেও না! আমি হচ্ছি অদৃশ্য মানুষ!'

শ্রীপুরের পাগলামি তাঁর শয়ন-ঘরেও ঢুকেছে? না, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখছেন? স্বপ্নের ঘোরেই তিনি যেন বললেন, এ্যাঁ?'

কণ্ঠস্বর আবার বললে, 'আমি হচ্ছি অদৃশ্য মানুষ!'

নিজের কানকে অবিশ্বাস করেও পূর্ণবাবু বললেন, 'অদৃশ্য মানুষ! অদৃশ্য মানুষকে দেখতে কি ঐ ব্যাণ্ডেজের মত?'

কণ্ঠস্বর বললে, 'না। ব্যাণ্ডেজটা আমার কোমরে বাঁধা আছে। তোমার বিছানার চাদর ছিঁড়ে এই ব্যাণ্ডেজ তৈরী হয়েছে।'

পূর্ণবাবু ভাবলেন, অদৃশ্য মানুষ যদি সত্যিকার মানুষই হয়, তাহলে অত্যন্ত অভদ্র তো! সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়েও তাঁকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করছে। কিন্তু এ সবই বাজে ধাপ্পা। ম্যাজিকের ফক্কিকারিতে তাঁকে ভোলানো এত সহজ নয়। সামনে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে তিনি ব্যাণ্ডেজটা ধরবার চেষ্টা করলেন। হঠাৎ দু'খানা তপ্ত



'আমার পকেট ছেঁড়া বটে, কিন্তু আমার টাকা থাকে ট্যাঁকে।' পৃঃ ৪০

রক্তমাংসের হাত তাঁর হাত সজোরে চেপে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর বললে, 'পূর্ণ, বিশ্বাস করো, সত্যিই আমি অদৃশ্য মানুষ!'

এইবার পূর্ণবাবুর গায়ে কাঁটা দিল। তিনি চেঁচিয়ে লোকজন ডাকবার উপক্রম করতেই দু'খানা অদৃশ্য হাত তৎক্ষণাৎ সজোরে তাঁর মুখ চেপে ধরল।

'পূর্ণ, বোকামি কোরো না। চ্যাঁচামেচি করলে তোমার ভালো হবে না! আমার গলা শুনেও তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? আমি হচ্ছি বিধু।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পূর্ণবাবু বললেন, 'বিধু!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিধু···অর্থাৎ বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মনে নেই, সিটি কলেজে তোমার সঙ্গে পড়তাম। দিনে তিরিশ কাপ করে চা খেতুম বলে তুমি আমাকে কেবলই ধমক দিতে। আশ্চর্য, এত শীঘ্র তুমি বন্ধুদের ভুলে যাও!'

পূর্ণবাবু আমতা-আমতা করে বললেন, 'বিধু! হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে বটে! কিন্তু অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে আমাদের সেই বিধুর কি সম্পর্ক? সে তো অদৃশ্য ছিল না!'

'না, তখন আমি অদৃশ্য ছিলুম না। এখন হয়েছি।'

'এও কি সম্ভব? মানুষ অদৃশ্য হতে পারে?'

'সে আলোচনা পরে করব। আপাততঃ আমায় কিছু খেতে দাও। আজ তিনদিন আমার পেটে অন্ন যায় নি।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'আজ আমার খিদে নেই বলে আমি কিছু খাই নি। আমার খাবার তোমার পাশের টেবিলেই চাপা দেওয়া রয়েছে। ইচ্ছে করলেই খেতে পারো।'

নিরাকার বিধুর আর তর্ সইল না। পূর্ণবাবু অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁর টেবিলের উপর রক্ষিত খাবারের থালার ঢাকনিটা হঠাৎ যেন জ্যান্ত হয়ে এক লাফ মেরে টেবিলের আর-এক পাশে গিয়ে পড়ল এবং তারপর খাবারগুলোও জ্যান্ত হয়ে শূন্যে টপাটপ

লাফ মারতে শুরু করল। খেতে-খেতে নিরাকার বিধু বললে, 'আঃ, এতক্ষণে যেন বাঁচলুম। আমি ঈশ্বরের মত নিরাকার হয়েছি বটে, কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে এখনও জয় করতে পারি নি। ভাগ্যিস দৈব-গতিকে তোমার বাড়িতেই এসে পড়েছি।'

'তোমার দেহ নিরাকার হয়েছে বটে, কিন্তু তোমার দেহের রক্ত তো চর্ম-চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারে না। ব্যাপার কি? তুমি আহত হয়েছ কেন?'

'সে অনেক কথা, পরে বলব'খন। আপাততঃ এইটুকু শুনে রাখো, একটা পাজী লোক আমার টাকা নিয়ে পালাচ্ছিল, তাকে ধরতে গিয়েই আমার এই বিপদ হয়েছে।···ভাই পূর্ণ, আজ আর আমি কথা কইতে পারছি না। তিনদিন আমি ঘুমোই নি, আমাকে ঘুমোবার একটু ঠাঁই দাও।'

'তুমি এই ঘরেই ঘুমোতে পারো, আমি অন্য ঘরে যাচ্ছি।'

'আর তোমার দু-একটি বাড়তি জামা-কাপড় আমাকে দিয়ে যাও।'

'আচ্ছা।'

নিরাকারের আত্মকথা ॥ এগারো

পূর্ণবাবু একখানা আলোয়ান, একটা গরম কোট, একটা ফ্লানেলের সার্ট, একখানা কাপড় ও এক জোড়া জুতো এনে দিলেন।

বিধু যখন সেইগুলো পরলে, তখন তার দেহের একটা নির্দিষ্ট গঠন পূর্ণবাবুর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল—যদিও জামার উপরে তার মুণ্ড, জামার হাতার তলায় তার হাত দুটো এবং হাঁটুর কাপড় ও জুতোর মাঝখানে তার পা-দুটো দৃশ্যমান হল না বলে সে দেহটাকে অত্যন্ত কিম্ভূতকিমাকার দেখাতে লাগল।

বিধু বললে, 'ভাই পূর্ণ, এইবার আমি একটু ঘুমিয়ে নেব। বাকি কথা সব কাল সকালে হবে।···হ্যাঁ, ভালো কথা! আমি এখানে আছি এ কথা তুমি কারুকে বলবে না তো?'

'কেন?'

লোকে আমার কথা টের পায়, এটা আমি পছন্দ করি না। সাবধান, আমার এ কথা যেন ভ্রমেও ভুলো না।'

পূর্ণবাবু সে-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে অন্য একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁর চোখে সে রাত্রে ঘুম এল না। একখানা ইজি-চেয়ারের উপরে বসে পড়ে তিনি নানা কথা ভাবতে লাগলেন।

'অদৃশ্য মানুষ! শ্রীপুরের আর সকলের মত আমারও মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? এও কি সম্ভব? হ্যাঁ, সমুদ্রের জলে যারা বাস করে, আমাদের চোখে তারা অদৃশ্য বটে! পুকুরের জলে যে সব জীব বাস করে, তারাও অদৃশ্য। কিন্তু পৃথিবীর হাওয়ার জগতে যারা বাস করে, তারা কখনও অদৃশ্য হতে পারে না।

ভেবে-চিন্তেও তিনি কূল-কিনারা পেলেন না।···রাত পুইয়ে গেল। সকাল বেলায় খবরের কাগজ এল। খবরের কাগজে পূর্ণবাবু অত্যন্ত আগ্রহের সহিত অদৃশ্য মানুষের সমস্ত কীর্তিকলাপ পড়ে ফেললেন। পড়ে যে কথাগুলি তিনি জানতে পারলেন, সেগুলি হচ্ছে এই:

১. অদৃশ্য মানুষ স্বাস্থ্যনিবাসের উপরে ভীষণ অত্যাচার করেছে।
২. অদৃশ্য মানুষ ডাক্তার মানিকবাবুর বাড়ি থেকে টাকা চুরি করেছে।
৩. অদৃশ্য মানুষ শ্রীপুরের অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষকে আহত করেছে।
৪. অদৃশ্য মানুষ শ্রীপুরের ব্যাঙ্ক থেকে কয়েক হাজার টাকার নোট নিয়ে পালিয়েছে এবং রাজপথের পথিকদের পকেট কেটে অনেক টাকা সরিয়েছে, ইত্যাদি।

পূর্ণবাবু নিজের মনেই বললেন, 'সর্বনাশ! বিধু কেবল অদৃশ্য নয়, উন্মত্তও বটে! ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে সে সাংঘাতিক কাণ্ডও করতে পারে। মানুষের সমাজের সমস্ত নিয়ম বদলে দিতে পারে। আর আমি কিনা তাকে স্বাধীনভাবে আমারই ঘরে ছেড়ে রেখে এসেছি। তাকে কি পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত? কখনোই নয়।

পূর্ণবাবু একখানা কাগজে তাড়াতাড়ি কি লিখলেন। তারপর কাগজখানা একখানা খামের ভিতরে পুরে চাকরকে ডেকে বললেন, 'এই চিঠিখানা চুপি চুপি থানায় দিয়ে এসো।'

ঠিক সেই সময়েই তাঁর শয়ন-ঘরের ভিতরে ঝন্‌ঝন্ করে একটা ভীষণ আওয়াজ হল, যেন কাঁচের কি কতকগুলো ভেঙে পড়ল! পূর্ণবাবু তাড়াতাড়ি শয়ন-ঘরের দিকে ছুটলেন।

ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখলেন, একটা জানলার সামনে বিধুর স্কন্ধ-কাটা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং জানলার সার্সির ভাঙা কাঁচগুলো ঘরের মেঝের উপরে ছড়িয়ে রয়েছে।

পূর্ণবাবু বললেন, 'এ কি ব্যাপার?'

বিধু বিরক্ত মুখে বললে, 'আমার মেজাজ বেজায় তিক্ত হয়ে আছে। কিছুই ভালো লাগছে না। ভয়ানক রাগ হচ্ছে। রাগের ঝোঁকে তোমার সার্সির কাঁচগুলো ভেঙে ফেলেছি।'

পূর্ণবাবু মনে মনে বললেন, 'উন্মাদ রোগের পূর্ব লক্ষণ।' প্রকাশ্যে বললেন, 'তুমি আজকাল মাঝে মাঝে এই রকম করো নাকি?'

'হ্যাঁ, করি।'

পূর্ণবাবু ঘরের ভিতর নীরবে খানিকক্ষণ পায়চারি করলেন। তারপর বিধুর সামনে গিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'বিধু, শান্ত হয়ে বসো। কেমন করে তুমি অদৃশ্য হলে সে কথা আমাকে বলো নি। আমার শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'অদৃশ্য হওয়া খুবই সহজ ব্যাপার।'

'তোমার কাছে সহজ হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এটা

একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার।'

'নিতান্তই শুনবে? তবে শোনো। কলেজ ছাড়বার পর আমি যে পদার্থ-বিজ্ঞান নিয়ে খুব মেতে উঠেছিলুম, সে কথা তুমি বোধহয় জানো না। মোহনপুরে আমার বাসা ছিল। সেখানে প্রায় দিন-রাত একটা ঘরে বন্দী হয়ে আমি কেবল পদার্থ-বিজ্ঞান নিয়ে হরেক রকম পরীক্ষা করতুম। সেই পরীক্ষার ফলেই অদৃশ্য হবার এই অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করেছি।'

'সে উপায়টা কি শুনি?'

'সে কথা ভালো করে বোঝাতে গেলে পদার্থ-বিজ্ঞানের অনেক কঠিন বিষয় নিয়ে এখন ব্যাখ্যা করতে হয়। সে সময় আমার নেই। তবে খুব সংক্ষেপে দু-একটা কথা বলছি, শোনো। ধরো, কাঁচের কথা। পাথরের চেয়ে কাঁচ স্বচ্ছ, তাই পাথরের ভিতর দিয়ে দেখা যায় না। কিন্তু কাঁচের ভিতর দিয়ে যায়। অস্পষ্ট আলোতে খুব পাতলা কাঁচ সহজে চোখে পড়ে না, কারণ সে আলো শোষণ ও প্রতিফলিত করতে পারে খুবই অল্প। সাধারণ সাদা কাঁচ তুমি যদি জলের ভিতরে ফেলে দাও, তাহলে সে বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। আবার জলের চেয়ে ঘন কোন তরল পদার্থের ভিতরে কাঁচকে ফেলে দিলে সে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়। কারণ, সেই তরল পদার্থ ভেদ করে খুব অল্প আলোই তার কাছে গিয়ে পৌঁছুতে পারে। ঠিক এই কারণেই বাতাসের ভিতরে হাইড্রোজেন গ্যাস অদৃশ্য হয়ে থাকে! কাঁচকে যদি ভেঙে গুঁড়ো করা হয় তাহলে বায়ু চলাচলের স্থানে তাকে রাখলে সকলেই দেখতে পায়। কিন্তু সেই দৃশ্যমান কাঁচের গুঁড়ো জলের মধ্যে ফেলে দিলে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়। সাদা কাগজ স্বচ্ছ নয়, তার ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চলে না। কিন্তু ভালো করে তেল মাখিয়ে সাদা কাগজকেও স্বচ্ছ করা যায়।...এই রকম সব ব্যাপারের উপরে নির্ভর করেই আমি এই অপূর্ব আবিষ্কার করেছি।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'তারপর কি হল বল ?'

বিধু বলতে লাগল ঃ

'কয়েক বৎসর চেষ্টার পরে যখন আমার মনে হল যে আমি পরীক্ষায় সফল হয়েছি, তখন একদিন একটা বিড়ালকে ধরে আনলুম। তারপর সেই বিড়ালের উপরে আমি আমার আবিষ্কৃত ওষুধ প্রয়োগ করলুম। বিড়ালটা ওষুধ খেয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। তারপর আমার চোখের সামনেই ধীরে ধীরে তার দেহ শূন্যে মিলিয়ে গেল। তার দেহ মিলিয়ে গেল বটে, কিন্তু তার মিউমিউ করে কান্নার জ্বালায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল। শেষটা অনেক কষ্ট করে ও তাড়াহুড়ো দিয়ে বিড়ালটাকে ঘর থেকে বিদায় করলুম। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে পথে গিয়ে আবার সে হৈ-চৈ বাধিয়ে তুললে। বিড়াল মিউমিউ করছে অথচ তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাজপথে বেশ ভিড় জমে গেল। যখন বিড়ালটাকে কিছুতেই আবিষ্কার করা গেল না, তখন তাকে ভূতুড়ে বিড়াল মনে করে সবাই সেখান থেকে পলায়ন করল।

এ ওষুধটা হয়তো এত শীঘ্র আমি নিজের উপরে প্রয়োগ করতুম না, কিন্তু বাধ্য হয়ে শেষটায় করতে হল। পূর্ণ, আমি যে ধনীর ছেলে নই, একথা তুমি জানো। সামান্য যা-কিছু পুঁজি-পাটা ছিল, এই পরীক্ষা শেষ করতেই তা ফুরিয়ে গেল। কয়েক মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি, বাড়িওয়ালা ভীষণ তাগাদা শুরু করলে। তাগাদায় যখন ফল হল না, তখন সে নালিশ করে আমার বিরুদ্ধে 'বডি ওয়ারেণ্ট' বার করলে। বাড়িওয়ালা ও ওয়ারেণ্টকে ফাঁকি দেবার জন্যে শেষটা আমি মরিয়া হয়ে ওষুধ খেয়ে অদৃশ্য হয়ে পড়লুম।

বাড়িওয়ালার চোখের সুমুখ দিয়েই আমি সরে পড়লুম, কিন্তু সে আমাকে মোটেই দেখতে পেল না। রাজপথে জনতার ভিতর দিয়ে লক্ষ্যহীনের মত এগিয়ে চললুম। কিন্তু খানিক দূর এগুতে না এগুতেই নানা রকম মুশকিল হতে লাগল। মোটরগাড়িগুলো হর্ণ না

দিয়েই আমার ঘাড়ের উপর দিয়ে চলে যেতে চায়! একটা মুটে একরাশ জিনিস-ভরা ঝাঁকা মাথায় করে আমার গায়ের উপরে এসে পড়ল। আমি সাঁৎ করে একপাশে সরে গেলুম বটে, কিন্তু আমার অদৃশ্য গায়ে ধাক্কা খেয়ে মুটেটা আশ্চর্য হয়ে এমনি চমকে উঠল যে তার সমস্ত মোট-ঘাট পথের উপরে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তার ঝাঁকার ভিতরে কাঁচের কি একটা জিনিস ছিল, তারই এক টুকরো ভেঙে আমার পায়ের তলায় ফুটে গেল ও ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। আমি কাঁচের টুকরোটা পা থেকে বার করে ফেলবার চেষ্টা করছি, ইতিমধ্যে সেখানে অনেক লোকজন জমে গেল। তারা মুটেটাকে বললে, 'তুই কাণা হয়ে পথ চলছিস নাকি? মুটেটা বললে, 'না বাবু, ভূতে আমায় ধাক্কা মেরেছে!' সব লোক হেসে উঠল। বললে, 'ঐ দেখুন, রক্তমাখা পায়ের দাগ!' বেগতিক দেখে আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে এলুম। কিন্তু কি আপদ, যতই অগ্রসর হই, রক্তমাখা পায়ের রেখা আমার পিছনে পিছনেই চলে! রাস্তার ভিড় ক্রমেই বেড়ে উঠল, সকলেই ভীত, বিস্মিত, স্তম্ভিত! সেই মস্ত ভিড় রক্তাক্ত পায়ের দাগ ধরে আমায় অনুসরণ করতে লাগল। তার উপরে পথের নেড়ী কুকুর গুলো ব্যাপারটা আরো সঙ্গীন করে তুলল। তারা আমাকে দেখতে পাচ্ছিল না বটে, কিন্তু তাদের তীব্র ঘ্রাণশক্তি অনায়াসেই আমাকে আবিষ্কার করে ফেললে! হতভাগারা আমাকে ঘেউ-ঘেউ করে কামড় দিতে এল। ব্যতিব্যস্ত হয়ে কি করব ভাবছি এমন সময় দেখি, একখানা ফিটনগাড়ি সেইখান দিয়ে যাচ্ছে। একলাফে তার উপরে উঠে পড়লুম, গাড়িখানা দুলে উঠল, গাড়োয়ান সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পিছন ফিরে একবার দেখলে, কিন্তু কিছুই না দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হয়ে আবার গাড়ি চালাতে লাগল।

খানিক পরেই আর এক নতুন বিপদ! একটা ভীষণ মোটা মেম হঠাৎ সেই গাড়িখানার উপরে চড়ে বসল। আমি তাড়াতাড়ি অন্য দরজা

দিয়ে আবার পথের উপরে লাফিয়ে পড়লুম। এবারে খুব সাবধানে সকলকে এড়িয়ে পথ চলতে লাগলুম। সন্ধ্যে পর্যন্ত এই রকম ঘুরে-ঘুরে রীতিমত ক্ষুধার উদ্রেক হল। একখানা খাবারের দোকানের একপাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। দোকানী যেই একটু অন্যমনস্ক হয়, অমনি খান দুই-তিন লুচি বা দু-একখানা কচুরি বা দু-একটা আলুর দম প্রভৃতি টপাটপ সরিয়ে ফেলি। কিন্তু দু-একটা খাবার মুখে ফেলেই নতুন এক বিপদের সম্ভাবনায় মুষড়ে পড়লুম। আমার দেহের রক্ত যেমন বাইরের আলো-হাওয়ার সংস্পর্শে এলে আর অদৃশ্য থাকে না, তেমনি বাইরের কোন খাবার জিনিসও হজম না হওয়া পর্যন্ত উদরের মধ্যে দৃশ্যমান হয়েই থাকে। এই সত্যটা ধরতে পেরেই পেটের খিদে পেটে নিয়েই পালিয়ে এলুম।

সারাদিন অনাহারে ঘুরে-ঘুরে শরীর এলিয়ে পড়ল। এখন উপায়? বাসায় ফেরবার পথ নেই, রাস্তায় রাস্তায় কতক্ষণ আর এমন করে ঘুরে বেড়াব? সারা দেহে এক টুকরো কাপড় নেই, তার উপরে পৌষ মাসের প্রখর শীত। কাঁপতে কাঁপতে ভাবতে লাগলুম, কোন রকমে যদি জামা-কাপড় ও জুতো যোগাড় করতে পারি, আর চশমা, ব্যাণ্ডেজ ও পরচুলা প্রভৃতির সাহায্যে মুখের অদৃশ্য অংশগুলো ঢাকা দিতে পারি, তাহলে আমার চেহারা খুব চমৎকার দেখতে না হলেও একরকম চলনসই হতে পারে। কেউ শুধোলে বললেই হবে যে, দৈব-দুর্ঘটনায় চোট খেয়েছি বলে মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হয়েছে!... আরো মিনিট পনেরো পথ চলবার পরই যা খুঁজছিলাম সেই সুযোগই পেলুম। একটা বাড়ির সামনে সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে, 'এককড়ি বিশ্বাস অ্যাণ্ড কোং এইখানে যাত্রা ও থিয়েটারের সকল রকম সাজ-পোশাক ও সরঞ্জাম সুলভে ভাড়া দেওয়া হয়।'

কোন রকম ইতস্তত না করে একেবারে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলুম। ঘরের ভিতরে একটা টাক-মাথা বুড়ো একটা বাক্সের সামনে মাদুরের উপর বসে একখানা খাতায় কি লিখছিল। আমার

পায়ের শব্দে চমকে উঠে মুখ তুলে দেখলে, কিন্তু সামনে কিছুই দেখতে না পেয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। চারিদিকে সিন্দুক, বাক্স আর তোরঙ্গ সাজানো রয়েছে, দেয়ালে হরেক রকম সাজ-পোশাক, পরচুল ও গোঁফ-দাড়ি ঝোলানো রয়েছে, নানা আকারের মুখোশ ও অস্ত্রশস্ত্র টাঙানো রয়েছে! আমি পা টিপে-টিপে একটা কোণের দিকে যাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু এমনি আমার কপাল যে, হঠাৎ আমার ধাক্কা লেগে একটা তোরঙ্গ গেল হুড়মুড় করে পড়ে। বুড়ো এবারে কাজ-কর্ম ফেলে একবারে উঠে দাঁড়াল। যে-তোরঙ্গটা পড়ে গিয়েছিল তার কাছে এসে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু কিছুই আবিষ্কার করতে না পেরে আরো বেশী হতভম্ব হয়ে গেল।

এ সুযোগ আমি ছাড়লুম না। হঠাৎ বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে জোরে তার গলা টিপে ধরলুম। দু-চারবার গোঁ-গোঁ করেই সে অজ্ঞান হয়ে গেল। তারপর···'

পূর্ণবাবু বিস্মিত স্বরে বলে উঠলেন, 'বল কি হে, তুমি অনায়াসেই বুড়োটার গলা টিপে ধরলে?

বিধু বললে, 'তখন এ ছাড়া আর কি উপায়ই-বা ছিল বল? যে অবস্থায় আমি পড়েছিলুম, আমাকে বাঁচতে হবে তো?'

পূর্ণবাবু বিরক্তভাবে বললেন, 'তাহলে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে অনায়াসেই তুমি অন্য কারুকে খুন করতে পারো? কি অন্যায়?'

বিধু উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললে, 'তা পারি। আত্মরক্ষা হচ্ছে জীবনের ধর্ম। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে নরহত্যা করা আমি অপরাধ বলে মনে করি না। এর ভেতরে তুমি অন্যায়টা দেখলে কোথায়?'

পূর্ণবাবু খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'বিধু, তোমার স্বভাব ঢের বদলে গেছে দেখছি। কিন্তু সে কথা থাক্। তুমি যা বলছিলে বল।'

বিধু আবার আরম্ভ করলে ঃ

'খানিকটা দড়ি নিয়ে বুড়োর হাত-পা আমি বেঁধে ফেললুম। তার মুখে কতকগুলো ন্যাকড়া গুঁজে দিলুম, যেন হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেয়ে চেঁচিয়ে না ওঠে। তারপর নিজের মনের মতন পোশাক বেছে নিয়ে পরলুম। পরচুল, দাড়ি-গোঁফ, একখানা ঠুলি-চশমা নিয়ে মুখের অদৃশ্য অংশ ঢাকা দিলুম। একটা মুখোশের নাক কেটে নিয়ে নিজের মুখের যথাস্থানে বসিয়ে দিলুম। তারপর মাথা থেকে গলা পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজ করে একখানা আরশির সামনে পরীক্ষা করে দেখলুম, আমার মুখখানা দেখতে অদ্ভুত হলেও অমানুষিক হয় নি। বুড়োর বাক্স হাতড়ে দুশো পঁচিশ টাকা পেলুম। নোট ও টাকাগুলো পকেটে পুরে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।'

পূর্ণবাবু আবার বললেন, 'পরের টাকা নিতে তোমার সঙ্কোচ হল না?'

বিধু বললে, 'কিছুমাত্র না! টাকা যার কাছে থাকে তারই হয়। লোকে তা বুঝলে এতদিনে পৃথিবীতে আর গরীব থাকত না। তারপর সেখানে থেকে বেরিয়ে এক হোটেলে ঢুকে আগে পেটের ক্ষুধাকে শান্ত করলুম! এরপর কেমন করে আবার নিজের বাসায় ফিয়ে গিয়ে আমার নথিপত্র ও ওষুধের শিশি-বোতলগুলি শ্রীপুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে নিজেও এখানে এসে হাজির হলুম, সে সব কথা আর না বললেও চলবে।···

শোনো পূর্ণ! আমি হচ্ছি অদৃশ্য মানুষ। কিন্তু নিরাকার হবার আগে অদৃশ্য হওয়ার যে সব আনন্দ মনে মনে কল্পনা করেছিলুম, আজ সে সব আকাশ-কুসুমের মত মিলিয়ে গিয়েছে। এখন আমার মত অসহায় আর কেউ নেই। আমাকে সবাই ভয় করে, ভীষণ শত্রু বলে মনে করে। কোন সাধারণ মানুষের সাহায্য না পেলে পৃথিবীতে আমার পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব। সেইজন্যই বংশীবদনকে আমার সঙ্গী করেছিলুম, কিন্তু সে হতভাগাও আমার

নথিপত্র ও টাকা চুরি করে আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে।'

পূর্ণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এখন কি করতে চাও?'

বিধু বললে, মনে করছি এখন তোমার এখানেই কিছুদিন থাকব। ভগবান তোমার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিয়েছেন। মনে করলেই আমরা দুজনেই দুজনের অনেক উপকার করতে পারি। তুমি আমাকে আশ্রয় দেবে, আমাকে লুকিয়ে রাখবে; আর আমি দুনিয়ার ঐশ্বর্য লুটে নিয়ে এসে তোমার কাছে সঁপে দেব। তুমি আমাকে সাহায্য করবে পূর্ণ?'

পূর্ণবাবু চুপ করে বসে রইলেন।

'চুপ করে রইলে যে? পূর্ণ! তুমি কি আমার কথায় রাজী নও?'

পূর্ণবাবু নীরবে যেন কি শুনতে লাগলেন।

'পূর্ণ! নীচে যেন দরজা খোলার শব্দ হল না?'

'কই, আমি শুনতে পাই নি!'

বিধু খানিকক্ষণ কান পেতে শুনলে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'উঁহু, সিঁড়ির ওপরে নিশ্চয়ই কাদের পায়ের শব্দ হচ্ছে! কারা যেন ওপরে আসচে?'

পূর্ণবাবুও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কে আবার আসবে?'

কিন্তু বিধুর সন্দেহ দূর হল না। সে তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু পূর্ণবাবু তার আগেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে হাজির হলেন।

বিধু গর্জন করে বললে, 'বিশ্বাসঘাতক!' পরক্ষণেই সঙ্গে সঙ্গে সে পূর্ণবাবুর উপরে লাফিয়ে পড়ল এবং দুই হাতে সবলে তাঁর গলা টিপে ধরে তাঁকে একটানে মেঝের উপরে আছড়ে ফেললে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে পূর্ণবাবু তখনি উঠে বসলেন এবং সেই অবস্থায় দেখলেন, তাঁর চোখের সামনেই জামা-কাপড়গুলো টান মেরে খুলে ফেলে বিধু আবার নিরাকার হয়ে গেল।

থানার দারোগা পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি উপরে আসছিলেন, এমন সময়ে আচমকা তাঁর দেহের উপরে হুড়মুড় করে একটা অদৃশ্য ভার এসে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনিও হলেন একেবারে কুপোকাৎ! দারোগা মশাই যখন দু'পায়ে ভর দিয়ে আবার দাঁড়িয়ে উঠলেন, তখন দেখা গেল, পূর্ণবাবু রক্তাক্ত মুখে বেগে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন।

তিনি দারোগাবাবুর সামনে এসে বললেন, 'অদৃশ্য মানুষ! সে আবার আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে!'

অদৃশ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ॥ বারো

পূর্ণবাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, আপনারা বুঝি ঢাক-ঢোল বাজিয়ে চোর ধরতে যান?'

দারোগাবাবু থতমত খেয়ে বললেন, 'কেন বলুন দিকি?'

পূর্ণবাবু আরো রেগে বললেন, 'কেন, এখনো তা বুঝতে পারছেন না? আপনারা এমন গোলমাল করে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছেন যে, সে আগে থাকতেই সাবধান হয়ে পালিয়ে গেল!'

দারোগাবাবু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'তাই তো, বড্ড ভুল হয়ে গেছে!'

'হ্যাঁ, এ ভুল শোধরাবার আর উপায় নেই। অদৃশ্য মানুষকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলেন। তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, সে বদ্ধ পাগল। সে মানুষের টাকা কেড়ে নেবে, নরহত্যা করবে, পৃথিবী তার অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠবে। আমি তার মনের সমস্ত কথাই শুনেছি। সে সব মানুষকে ঘৃণা করে, আজেকের ব্যাপারের পর সে আর কারুকেই ক্ষমা করবে না। ছি-ছি, কি সর্বনাশটাই না করলেন বলুন দেখি?'

দারোগাবাবু ম্রিয়মাণ মুখে বললেন, 'তাকে কি ধরবার আর কোন উপায়ই নেই ?'

পূর্ণবাবু বললেন, উপায় থাক আর না থাক, আমাদের চেষ্টা করতে হবে তো !···দাঁড়ান, হয়েছে ! শুনুন, শ্রীপুরের চারিদিকে চৌকিদার রাখুন···তারা সব পথ-ঘাট আগলে থাকুক। পথে-ঘাটে কুকুরেরা ঘেউ-ঘেউ করলেই খোঁজ নিন। তার মুখেই আমি শুনেছি, সে অদৃশ্য হলেও কুকুরেবা তার অস্তিত্বের টের পায় ! শ্রীপুরের সমস্ত লোককে সশস্ত্র আর সাবধান হয়ে থাকতে বলুন। কেউ যেন তার বাড়ির ভিতরে ঢোকবার পথ খোলা না রাখে। সর্বত্রই খাবার-দাবার যেন লুকিয়ে রাখা হয়, যেন সে খাবার চুরি করতে না পারে, যেন সে অনাহারে থাকে !'

দারোগাবাবু বললেন, 'তাহলে আপনিও আসুন, এ বিষয়ে চট-পট একটা ব্যবস্থা করে ফেলা যাক।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'যাচ্ছি। কিন্তু আর একটা কথা জেনে রাখুন। তার অদৃশ্য দেহের ভিতরে হজম না হওয়া পর্যন্ত খাবার দেখা যায়। খাবার হজম করবার জন্যে তাকে লুকিয়ে থাকতে হবে। এখানকার প্রতিটি বনে-জঙ্গলে আর ঝোপ-ঝাড়ে পাহারা দেবার জন্যে লোক রাখতে হবে। যদি দরকার হয়, পথে-ঘাটে কাঁচের টুকরোও ছড়িয়ে রাখতে হবে। তার পা আহত হলে রক্ত পড়ে, আর সে-রক্ত অদৃশ্য নয়। জানি, এ ব্যবস্থা অত্যন্ত নিষ্ঠুর। কিন্তু উপায় কি ? সে একে অদৃশ্য, তার ওপরে পাগল আর হিংস্র জন্তুর মত ভয়ঙ্কর।'

দারোগাবাবু বললেন, 'এত আটঘাট বেঁধে কাজ করতে তো বলছেন, কিন্তু তার আগেই সে যদি এ-মল্লুক ছেড়ে পালিয়ে যায় ?'

পূর্ণবাবু বললেন, 'সে এখনি এখান থেকে নড়বে বলে মনে হয় না। বংশী বলে কে একজন লোক তার দরকারি নথিপত্র নিয়ে পালিয়েছে। আমার মনে হয়, সেগুলো সে আগে ফিরে পাবার

চেষ্টা করবে।'

দারোগাবাবু বললেন, 'তাহলে আর দেরি নয়। আসুন, বেরিয়ে পড়া যাক।'

দুজনে দ্রুতপদে নীচে নেমে গেলেন।

দৃশ্যে ও অদৃশ্যে ॥ তেরো

অদৃশ্য মানুষ নিশ্চয় দুর্জয় ক্রোধে অন্ধের মত হয়ে পূর্ণবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। কারণ সেই বাড়ির দরজার সামনে তখন একটি ছোট শিশু নিজের মনে খেলা করছিল। আচম্বিতে কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে শূন্যে তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং বেচারীর একখানা পা ভেঙে যায়।

তারপর ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে তার আর কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। হয়তো পূর্ণবাবুর বিশ্বাসঘাতকতায় ও নিজের আশায় নিরাশ হয়ে কিছুক্ষণের জন্য সে অত্যন্ত দমে গিয়েছিল এবং কোন নির্জন স্থানে নিশ্চেষ্টভাবে বসে ভবিষ্যতের কর্তব্য স্থির করে নিচ্ছিল।

কিন্তু সে জানতে পারলে না, ইতিমধ্যে তার বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রীপুর কি রকম জাগ্রত হয়ে উঠেছে। শ্রীপুরের ঘরে-ঘরে প্রত্যেকের সদর দরজা আজ বন্ধ। কোন স্কুল, কলেজ ও আপিসও আজ খোলা নেই। খাবারওয়ালারা পর্যন্ত তাদের দোকানে ঝাঁপ তুলে দিয়েছে এবং পথে-পথে সেপাইরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে।

শ্রীপুর শহরের প্রান্তে নদীর ঘাটে খেয়া পারাপারা আজ বন্ধ। শ্রীপুর স্টেশনে সমস্ত ট্রেনের কামরার দরজা আর জানলা আজ বন্ধ! শ্রীপুর থেকে মালগাড়ি যাওয়াও আজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কি জানি, খোলা মালগাড়ি পেয়ে অদৃশ্য মানুষ পাছে তার উপরে

চড়ে সকলের অজান্তে পলায়ন করে।

মাঠে-ঘাঠে বনে-জঙ্গলে আনাচে-কানাচে মোটা-মোটা লাঠি-সোঁটা, রাম-দা, তরোয়াল ও সড়কি নিয়ে দলে দলে লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং বাতাসে কোথাও একটা পাতা নড়লেই হাঁ-হাঁ করে সেই দিকে ছুটে যাচ্ছে।

অদৃশ্য মানুষ যে শ্রীপুরের মায়া এখনো ত্যাগ করে নি, শীঘ্রই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

শ্রীপুরের এক পাটকলের ম্যানেজার ছিলেন চন্দ্রভূষণবাবু। সন্ধ্যার কিছু আগে নদীর ধারে মাঠের ভিতরে হঠাৎ তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেল। চন্দ্রবাবুর সর্বাঙ্গে ভয়ানক প্রহারের চিহ্ন এবং তাঁর মাথাটাও কে ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়ে গেছে। চন্দ্রবাবুর মৃতদেহের পাশে তাঁর নিজের মোটা বেতের লাঠিটা দু-টুকরো হয়ে পড়েছিল এবং তারই খানিক দূরে ছিল একটা মোটা লোহার রক্তমাখা গরাদে। বেশ বোঝা গেল, ঐ গরাদের সাহায্যেই চন্দ্রবাবুকে কেউ হত্যা করে গিয়েছে।

এই ঘটনার পর শহরময় অত্যন্ত হৈ-চৈ পড়ে গেল। চন্দ্রাবাবু ছিলেন নির্বিরোধী ভালোমানুষ লোক, শ্রীপুরে কেউ তাঁর শত্রু ছিল না। সুতরাং সকলেরই ধাবণা হল, অদৃশ্য মানুষ ছাড়া এ কাজ আর কেউ করে নি। কিন্তু চন্দ্রবাবুকে খামোকা সে খুন করতে যাবে কেন? এ-খুন যে টাকার জন্য নয় তার প্রমাণ, চন্দ্রবাবুর পকেট থেকে মনিব্যাগটা হারায় নি। তবে?...

অনেক খোঁজাখুঁজির পর সঠিক ব্যাপারটা জানা না গেলেও একটা হদিস পাওয়া গেল। মাঠের ধারের একখানা বাড়ি থেকে একটি ছোট মেয়ে যা দেখেছিল, তাই নিয়ে সকলে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল। মেয়েটি বলে, মাঠের উপর দিয়ে একটি লোহার গরাদে ঠিক পাখীর মতই নাকি উড়ে যাচ্ছিল, আর তার



বিধু গর্জন করে বললে, 'বিশ্বাসঘাতক!' পৃষ্ঠা ৬৭

পিছনে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটছিলেন চন্দ্রবাবু। মেয়েটি তার পরের ঘটনা আর কিছু বলতে পারলে না।

মেয়েটির কথায় সবাই যা আন্দাজ করলে তা হচ্ছে এই : অদৃশ্য মানুষ বোধহয় সশস্ত্র হবার জন্যে কোন বাড়ির জানলা থেকে এই লোহার গরাদেটা খুলে নিয়েছিল। সে যখন মাঠের উপর দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তাকে দেখা না গেলেও তার হাতের লোহার গরাদটা অদৃশ্য হয় নি। তারপর সেই উড়ন্ত গরাদটা দেখে চন্দ্রবাবু বোধহয় আশ্চর্য হয়ে তাকে নিজের হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করবার চেষ্টা করেছিলেন। অদৃশ্য মানুষ তাঁর হাত এড়াবার চেষ্টা করেও যখন মুক্তি পায় নি, তখন তাঁকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে।

চন্দ্রবাবুকে হত্যা করে অদৃশ্য মানুষ যে কোন্ দিকে গেল তাও সঠিক বোঝা গেল না। তবে, ইতিমধ্যে তার বিরুদ্ধে যে মস্ত একটা চক্রান্তের সৃষ্টি হয়েছে, এটা বোধহয় সে বুঝে নিয়েছিল। কারণ, চারিদিকে এমন সতর্ক পাহারা সত্ত্বেও কেউ তাকে আর আবিষ্কার করতে পারলে না।

তবে সন্ধ্যার পরে একদল কুলী যখন মাঠ পার হয়ে শ্রীপুরের দিকে আসছিল, তখন তারা নাকি শুনতে পেয়েছিল যে, মাঠের ভিতরে কোন অদৃশ্য কণ্ঠ থেকে কখনো কান্নার, কখনো হাসির এবং কখনো বা গর্জনের রোমাঞ্চকর শব্দ হচ্ছে। ভূত মনে করে কুলীরা প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে এসেছিল।

সকাল বেলায় পূর্ণবাবু একখানা অদ্ভুত পত্র পেলেন। চিঠিখানা 'বেয়ারিং'। পত্রলেখক লিখছে ঃ

'পূর্ণ, তুমি খুবই চালাক আর সাধু লোক, নয় ? আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলুম। আর তুমি কিনা বন্ধু হয়েও আমাকে ধরিয়ে দিলে। আমার সঙ্গে এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করে তোমার কি স্বার্থসিদ্ধি হবে, তা তুমিই জানো। তোমারি চক্রান্তে একটা দিন আমাকে হাটে-মাঠে ঘেয়ো কুকুরের মত পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। যাতে আমি খেতে ও ঘুমোতে না পারি সেজন্যে তুমি কোন সুব্যবস্থা করতেই বাকি রাখো নি। তবু আমি পেট ভরে খেয়েছি ও সারারাত প্রাণ ভরে ঘুমিয়েছি। এ খবর শুনে তুমি বোধহয় খুব খুশী হবে ?

এইবারে আসল নাটক শুরু হবে। হাসির নাটক নয়, বিয়োগান্ত নাটক, অর্থাৎ তার মধ্যে পতন ও মৃত্যুর কোনই অভাব হবে না।

এ চিঠি যখন তুমি হাতে পাবে, তখন থেকেই বিভীষিকা শুরু হবে। আজ থেকে শ্রীপুরের রাজা আর কেউ নয়, এখানে এখন কেবল আমারই একছত্র আধিপত্য। শ্রীপুরের সর্বশক্তিমান মহারাজা হচ্ছি আমি, অদৃশ্য মানব ! কাকে রাখব আর কাকে মারব সে-কথা কেবল আমিই জানি।

তবে, প্রথম দিনে আমি কি করব, সে কথাটা তোমার কানে-কানে চুপিচুপি আমি জানিয়ে রাখছি। আমার সঙ্গে শত্রুতা করলে কি হবে, তার একটা দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যে প্রথম দিনেই একজনের জন্যে আমি প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেছি। আসামীর নাম হচ্ছে, বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মৃত্যুর দূত এখনি তার দিকে অগ্রসর হয়েছে। সে ঘরের দরজায় চাবি বন্ধ করে বসে থাকতে পারে, বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে, নিজের চারিদিকে অগুনতি

সেপাই রাখতে পারে···সে যা খুশি করতে পারে, কিন্তু তবু মৃত্যু, অদৃশ্য মৃত্যু তাকে গ্রহণ করবার জন্যে এগিয়ে আসছে! তাকে আমি খুব সাবধান হতে বলি, কারণ লোকে তাহলেই বুঝতে পারবে যে, সাবধান হলেও আমার হাত থেকে রক্ষা নেই। যে তাকে সাহায্য করবে তাকেই মরতে হবে। তুমি শুনে রাখো বন্ধু, আজকে পূর্ণের মৃত্যু-দিবস !'

পূর্ণবাবু চিঠিখানা হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে বললেন, 'বিধু ঠাট্টা করে এ চিঠিখানা লেখে নি। সে তার মনের কথাই খুলে লিখেছে।'

তিনি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সামনে যে গরম চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, সে দিকেও তাঁর কোন খেয়ালই রইল না। আগে চাকরকে ডেকে তিনি বাড়ির ভিতরে ঢোকবার সব পথ বন্ধ করে দিতে বললেন, তারপর দেরাজের ভিতর থেকে একটা রিভলবার বার করে নিজের পকেটে পুরলেন। তারপর ঘরের ভিতরে পায়চারি করতে করতে নিজের মনেই বললেন, 'বিধু! তাহলে কাল আহার আর নিদ্রা থেকে তুমি বঞ্চিত হও নি? বেশ, বেশ! তাই মনের আনন্দে তুমি আমার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেছ। এও মন্দ কথা নয়! কিন্তু বিধু, তুমি যতই অদৃশ্য হও, টেক্কা মারব কিন্তু আমিই!' বলতে বলতে তিনি টেলিফোনের কাছে গিয়ে হাজির হলেন এবং থানার দারোগাকে সকল কথা জানালেন।

দারোগাবাবু বললেন, 'আমি এখনি আপনার বাড়িতে যাচ্ছি।'

টেলিফোনের কাছ থেকে তিনি একটা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ রাজপথের দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের মনেই আবার বললেন, 'কে জানে, বিধু এতক্ষণে আমার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কি না? হয়তো সে এখন পথে দাঁড়িয়ে আমার পানেই তাকিয়ে আছে!'

একটা কি জিনিস ঝুপ্ করে জানলার সার্সির উপরে এসে

পড়ল। পূর্ণবাবু আঁতকে উঠে তাড়াতাড়ি পিছু হটে এলেন এবং তারপর উচ্চস্বরে হেসে উঠে বললেন, 'চড়ুই পাখী! আমার মনে নিশ্চয় ভয় ঢুকেছে, নইলে সামান্য একটা চড়ুই পাখী আমাকে এমন চমকে দিতে পারে?'

সদর দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ হল। তিনি নিজে নেমে গেলেন। দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে?'

দরজার ওপাশ থেকে দারোগাবাবু সাড়া দিলেন।

পূর্ণবাবু দরজার খিল খুলে দরজাটা একটুখানি ফাঁক করে আগে উঁকি মেরে দেখে নিলেন, সত্যিই দারোগাবাবু কি না? তারপর নিঃসন্দেহ হয়ে দরজার একপাটি খুব কম করে খুলে দারোগাবাবুকে ভিতরে এনে আবার খিল তুলে দিলেন।

দুজনে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবার আগেই শুনলেন, একটা ঘরের ভিতর থেকে ঝন্‌ঝন্ করে সার্সি ভাঙার আওয়াজ এল।

দুজনে সে-ঘরে গিয়ে ঢুকতে-না-ঢুকতেই আরো কতকগুলি সার্সির কাঁচ ভেঙে পড়ল! পূর্ণবাবু বিবর্ণ মুখে বললেন, 'বিধু তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছে। আমার বাড়ি অবরোধ শুরু হল।'

দারোগাবাবু বললেন, 'বাড়ির বাইরে থেকে কোন কিছু ধরে কেউ ওপরে উঠতে পারবে না তো?'

'টিকটিকি আর পাখী ছাড়া আর কেউ পারবে না।'

দুম্‌দাম, ঝনঝনাঝন্, ঠক্‌ঠকাঠক্। বড়-বড় ঢিল বৃষ্টি হচ্ছে, কতগুলো সার্সি ভাঙল গুণে বলা দায়! অদৃশ্য মানুষকে দেখা যাচ্ছে না, বাড়ির ভিতরে ঢুকতে না পেরে সে ঢিল ছুঁড়েই মনের আক্রোশ মিটিয়ে নিচ্ছে।

পূর্ণবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'এখন কি করা যায় বলুন দেখি?'

দারোগাবাবু বললেন, 'একটা উপায় অবশ্য আমার মনে

আসছে। আপনি কাল বললেন না, কুকুররা অদৃশ্য মানুষের গন্ধ পায় ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেছিলুম বটে !'

'আমার তিনটে ডালকুত্তা আছে, বলেন তো নিয়ে আসি। তারা চোখে দেখতে না পেলেও ঐ দুরাত্মাকে ঠিক ধরে ফেলবে।'

'কিন্তু বাইরে যাবেন কেমন করে ? বিধু যে পথ আগলে আছে।'

'আপনার রিভলবারটা যদি দেন, তাহলে ঠিক আমি যেতে পারব। রিভলবারটা দেখলে ও বদমাইসটা নিশ্চয়ই আমার কাছে আসবে না।'

পূর্ণবাবু অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রিভলবারটা দারোগাবাবুর হাতে সমর্পণ করলেন। তারপর নীচে নেমে আচমকা সদর দরজাটা খুলে দারোগাবাবুকে বার করে দিয়েই তখনি আবার দরজা বন্ধ করে দিলেন।

দারোগাবাবু পূর্ণবাবুর বাড়ির ডানদিকের মাঠ দিয়ে সাবধানে চারিদিকে চোখ রেখে অগ্রসর হলেন। হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর বললে, 'তুমি দাঁড়াও !'

দারোগাবাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে রিভলবারটা মুঠোর ভিতরে চেপে ধরলেন।

কণ্ঠস্বর বললে, তুমি কোথায় যাচ্ছ ?'

বুকের ধুকপুকুনি সামলে নিয়ে দারোগাবাবু মুখবিকৃতি করে বললেন, 'সে খবরে তোমার দরকার কি ?'

পরমুহূর্তেই দারোগাবাবুর নাকের উপরে যেন একটা পাঁচ সের ওজনের ঘুষি এসে পড়ল। ধপাস করে মাটির উপরে বসে পড়ে যখন তিনি চোখের সামনে রাশি-রাশি সর্ষেফুল-ফোটা দেখতে লাগলেন, তখন হঠাৎ কার অদৃশ্য হস্ত এসে তাঁর হাত থেকে রিভলবারটা ছিনিয়ে নিলে।

কণ্ঠস্বর বললে, 'যাও, বাড়ির ভেতরে যাও। নইলে···'

দারোগাবাবু হতাশভাবে মুখ তুলে দেখলেন, যেন কোন এক

যাদুবিদ্যার বলেই শূন্যে একটা রিভলবার স্থির হয়ে আছে, আর তার নলচেটা তাঁরই দিকে ফেরানো।

কণ্ঠস্বর বললে, 'উঠে দাঁড়াও! আমার সঙ্গে কোনরকম চালাকি খেলতে এসে না। মনে রেখো, তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি তোমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সুড়সুড় করে ভালো মানুষটির মতন বাড়ির ভেতরে ফিরে যাও।'

দারোগাবাবু বললেন, পূর্ণবাবু আর আমাকে দরজা খুলে দেবেন না।'

কণ্ঠস্বর বললে, 'কিন্তু তোমাকে ফিরে যেতেই হবে। নইলে তুমি লোকজন ডেকে নিয়ে আসবে। তোমার সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নেই, কিন্তু আমার কথা না শুনলে তোমাকে আমি হত্যা করতে বাধ্য হবো।'

দারোগাবাবু আচম্‌কা এক লাফ মেরে রিভলবারটা অদৃশ্য হাত থেকে কেড়ে নিতে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারের মুখ থেকে দপ্‌ করে বিদ্যুৎশিখা জ্বলে উঠল এবং পরমুহূর্তেই দারোগাবাবুর দেহ ঘুরে মাটির উপরে আছাড়ে পড়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল।

দোতলার একটা জানলার পাল্লা ফাঁক করে পূর্ণবাবু সমস্ত দৃশ্যই দেখছিলেন এবং ইতিমধ্যেই সাহায্যের জন্যে টেলিফোনে তিনি থানায় খবরও দিয়েছিলেন। দারোগাবাবুর পতনের পর রিভলবারটা সেখানেই শূন্যে দুলতে লাগল। এমন সময় দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ শুনে পূর্ণবাবু তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়ে দেখলেন থানা থেকে চারজন পাহারাওয়ালা এসে হাজির হয়েছে। তিনি চট্‌ করে তাদের ভিতরে এনে আবার দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'তোমাদের দারোগাবাবু আর বেঁচে নেই। অদৃশ্য মানুষের হাতে রিভলবার আছে। খুব সাবধান।'

বাড়ির পিছন দিকের একটা দরজার উপরে হুম্‌হুম্‌ করে পদাঘাতের শব্দ হতে লাগল। খিড়কির সে-দরজাটা তেমন মজবুত ছিল না, অদৃশ্য মানুষ বোধহয় সেটা আবিষ্কার করে ফেলেছে।

পাহারাওয়ালাদের নিয়ে পূর্ণবাবু সেইদিকে ছুটলেন, কিন্তু তার আগেই খিড়কির দরজার পলকা খিলটা সশব্দে ভেঙে গেল।

পূর্ণবাবু চিৎকার করে বললেন, 'অদৃশ্য মানুষ বাড়ির ভেতরে ঢুকল। মনে রেখো, তার হাতে রিভলবার আছে।'

পাহারাওয়ালারা দু'হাতে লাঠি ধরে এদিকে ওদিকে লুকিয়ে একেবারে প্রস্তুত হয়ে রইল। উপরি-উপরি দু-বার রিভলবারের গর্জন শোনা গেল। কিন্তু তার আগেই পূর্ণবাবু তড়াক করে মস্ত এক লাফ মেরে একটা ঘরে ঢুকে পড়ে সে-যাত্রা প্রাণ রক্ষা করলেন।

অদৃশ্য মানুষকে দেখা গেল না বটে, কিন্তু এটা দেখা গেল যে, একটা চকচকে রিভলবার শূন্যপথে থেকে থেকে ক্রমশই এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ একটা পাহারাওয়ালা গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে রিভলবারের পিছনদিকে প্রচণ্ড এক লগুড়াঘাত করলে। একটা যন্ত্রনাময় চিৎকারের সঙ্গে-সঙ্গে রিভলবারটা ছিটকে তফাতে গিয়ে পড়ল। অদৃশ্য মানুষের হাতে আর রিভলবার নেই দেখে পূর্ণবাবু ও অন্য তিনজন পাহারাওয়ালা আবার বাইরে বেরিয়ে এল।

যতক্ষণ অদৃশ্য মানুষের হাতে রিভলবারটা ছিল, ততক্ষণ তবু তার একটা নিশানা পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু এখন সে যে কোথায় আছে সে-রহস্য কিছুই বোঝা গেল না।

কিন্তু যে পাহারাওয়ালা তার হাতে লাঠি মেরেছিল, তাকে সে ক্ষমা করলে না। উঠানের এক কোণে একটা টুল ছিল, হঠাৎ সেখানা শূন্যে উঠে ঘুরতে-ঘুরতে প্রথম পাহারাওয়ালার মাথার উপরে এসে পড়ল। বিকট চীৎকার করে সে ধরাশায়ী হল।

তারপরেই পূর্ণবাবু সভয়ে দেখলেন, রিভলবারটা মাটির উপর

থেকে শূন্যে লাফিয়ে উঠল। চোখের নিমেষে বাকি পাহারাওয়ালারা আবার অদৃশ্য হল এবং পূর্ণবাবু এবার খিড়কির দরজা দিয়ে একেবারে বাড়ির বাইরের দিকে দৌড় দিলেন। দুম্ করে রিভলবারের একটা শব্দ হল, কিন্তু সে গুলিও তাঁকে স্পর্শ করতে পারল না।

অদৃশ্য মানুষ দৃশ্যমান হল ॥ পনেরো

পূর্ণবাবু ঝড়ের মত বেগে মাঠের উপর দিয়ে ছুটছেন। রিভলবারের লক্ষ্যকে ব্যর্থ করবার জন্যে তিনি সাপের মতন এঁকে-বেঁকে ছুটতে লাগলেন। খানিক দূর গিয়ে মুখ ফিরিয়েই তিনি দেখতে পেলেন, সেই নাছোড়বান্দা রিভলবারটা তখনো বেগে তাঁর অনুসরণ করছে।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! ছুটন্ত মানুষ ও তার পিছনে শূন্যপথে উড়ন্ত রিভলবার! বাজারের একখানা ছবিতে দেখা যায়, ভীত পরশুরামের পিছনে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র শূন্যপথে তেড়ে আসছে। এ দৃশ্যও অনেকটা সেই রকম।

রিভলবার আরো দু-বার অগ্নিময় ধমক দিলে, কিন্তু তাও ব্যর্থ হল। অদৃশ্য মানুষ নিশ্চয়ই রিভলবার ছোঁড়ায় অভ্যস্ত ছিল না, তাই এবারের মত পূর্ণবাবু কোন গতিকে প্রাণে বেঁচে গেলেন। কিন্তু তবু সে পূর্ণবাবুর পিছু ছাড়লে না। খালি রিভলবারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাঁকে ধরবার জন্যে আরো জোরে অদৃশ্য পা-দুটো চালিয়ে দিলে।

আমাদের ডাক্তার মানিকবাবু সেদিন পথের ধারে একটা পুকুর-ঘাটে বসে নিজের মনে মাছ ধরছিলেন। মানিকবাবুর জীবনে এই একটি মাত্র শখ আছে। আর, তাঁর এ-শখ এমনি দুর্দান্ত যে, তিনি

শীত-গ্রীষ্ম মানতেন না, যে কোন পুকুর-ঘাটে গিয়ে ছিপ নিয়ে বসে পড়তেন। কিন্তু এমন একজন অকৃত্রিম মাছ শিকারীর উপরে মাছের দল মোটেই সদয় ছিল না, ঘাটের উপরে তাঁকে দেখলেই তারা যেন ছিপকে 'বয়কট' করত। অবশ্য সেজন্য মানিকবাবুর উৎসাহ বিন্দুমাত্র কমে নি। কেউ ঠাট্টা করলে উল্টে বলেন, 'ওহে, মাছ ধরতে গেলেই যে ছিপে মাছ পড়বে, এর কিছু মানে আছে ? তোমরা তো রোজ কত রকমের মন্ত্র পড়ে ভগবানকে ডাকো, কিন্তু ভগবান তোমাদের দেখা দেন কি ?' এমন অকাট্য যুক্তির উপরে কারুর আর কোন কথা বলবার থাকত না।

মানিকবাবু একমনে মাছ ধরছেন, অর্থাৎ ধরবার চেষ্টা করছেন, এমন সময়ে দ্রুত পদশব্দ শুনে মানিকবাবু মুখ তুলে দেখলেন, ভয়-ব্যাকুল পূর্ণবাবু পথের উপর দিয়ে তীরবেগে ছুটে চলেছেন এবং ছুটতে ছুটতে চীৎকার করে বলেছেন, 'অদৃশ্য মানুষ ! অদৃশ্য মানুষ !'

পুকুর-ঘাটে বসে মানিকবাবুর আর বেশী কিছু শোনবার দরকার হল না। তখন জলের মাছ ডাঙায় না তুলে, অদ্ভুত একটা ডিগবাজি খেয়ে ডাঙার মানুষ মানিকবাবু ঝুপ করে একেবারে জলের ভিতরে প্রবেশ করলেন।

মাছেরা সেদিন কি ভাবলে জানি না। হয়তো তারা ভাবলে, ডাঙায় বসে রোজ বিফল হয়ে মানিকবাবু রাগ করে আজ তাদের ধরবার জন্যেই জলের ভিতরে ঝাঁপ দিয়েছেন।

মাছেরা কি ভাবলে আর না ভাবলে সেটা ভাববার অবসর মানিকবাবুর মোটেই রইল না। কারণ, তিনি সাঁতার জানতেন না। জলের ভিতরে প্রবেশ করেই সে কথাটা তাঁর মনে পড়ল। ভুঁড়ি ভরে জল খেতে-খেতে একখানা নিরেট জগদ্দল পাথরের মত ক্রমেই তিনি নীচের দিকে নামতে লাগলেন। তারপরেই হঠাৎ তাঁর মনে হল, জলের ভিতরে এত নীচে নামা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পাগলের মত দু-বার হাত-পা ছুঁড়তেই তাঁর দেহটা আবার উপরের

দিকে উঠতে লাগল।

পুকুরের ধারে একটা মস্ত বটগাছ জলের ভিতরে অনেকগুলো ঝুরি ঝুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল···জলের ঝুরি ঝুলিয়ে সেও যেন মাছ ধরবার চেষ্টা করছে! ভাগ্যিস্ মানিকবাবুর দেহটা ঠিক সেইখানেই ভুস্ করে ভেসে উঠল, তাই বটের ঝুরি ধরে সে-যাত্রা মানে-মানে তিনি তাঁর পৈতৃক প্রাণটি রক্ষা করলেন।

মানিকবাবু নিজের মনেই বললেন, 'বাপ্! যে জলটা আজ খেয়েছি, এ-জীবনে বোধহয় আর জলতেষ্টা পাবে না। অদৃশ্য মানুষের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে শেষটা আজ আত্মহত্যা করে-ছিলুম আর কি! কিন্তু পূর্ণবাবুর কি হল?'···

মানিকবাবু ভয়ে-ভয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখলেন, কিন্তু পূর্ণবাবুর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।

ওদিকে কিন্তু ইতিমধ্যেই পাশা উল্টে গেছে।

পূর্ণবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাহারাওয়ালারা থানায় গিয়ে খবর দিয়েছে এবং সেখান থেকে দলে-দলে সেপাই পূর্ণবাবুকে রক্ষা করবার জন্য ছুটে এসেছে।

এখন পালাবার পালা হচ্ছে অদৃশ্য মানুষের।

কিন্তু পাছে সে আরার ফাঁকি দেয় সেই ভয়ে পূর্ণবাবু সেপাইদের ডেকে চেঁচিয়ে বললেন, 'শীগগির হাত ধরাধরি করে সবাই গোল হয়ে দাঁড়াও। অদৃশ্য মানুষ এর মধ্যেই আছে।'

সকলে তাড়াতাড়ি পূর্ণবাবুর কথামত কাজ করল।

পূর্ণবাবু আবার বললেন, 'সবাই ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে চক্রটাকে ছোট করে আনো। তাহলে অদৃশ্য মানুষ আর পালাতে পারবে না!'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই বিপুল বিক্রমে অদৃশ্য মানুষ আগে তাঁকেই আক্রমণ করলে। এবারে পূর্ণবাবুও তাকে ছাড়লেন না,

তার অদৃশ্য দেহটাকে তিনি দুই হাতে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর দুজনে জড়াজড়ি করে পথের উপরে গিয়ে পড়লেন।

সেপাইরা সবাই ছুটে এল। হাত দিয়ে অনুভব করে সকলে মিলে অদৃশ্য মানুষের মাথা, গলা, বুক, কোমর, জানু ও পা সজোরে চেপে ধরলে।

অদৃশ্য মানুষ একবার যন্ত্রণা-বিকৃত বদ্ধ স্বরে চিৎকার করে উঠল, 'উঃ! গেলুম।' তারপরই তার সমস্ত দেহ একেবারে স্থির হয়ে গেল।

পূর্ণবাবু বলে উঠলেন, 'ওকে ছেড়ে সরে দাঁড়াও! ও আহত হয়েছে, আর পালাতে পারবে না।'

সেপাইরা কেউ কেউ বললে, 'বদমাইসটা দুষ্টুমি করে চুপ করে আছে, ছেড়ে দিলেই পালাবে।'

পূর্ণবাবুর ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছিল। তাঁরও শরীরের নানা জায়গায় কাটাছেঁড়ার দাগ। সেই অবস্থাতেই তিনি উঠে অদৃশ্য মানুষের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে আন্দাজে তার বুকের উপরে হাত রেখে বললেন, 'না, বিধু আর পালাতে পারবে না। ওর হৃৎপিণ্ড স্থির হয়ে গেছে। ও আর বেঁচে নেই।'

তখন শ্রীপুর শহরের সমস্ত লোক সেইখানে এসে জড়ো হয়েছিল। সকলেরই মুখে বিস্ময় ও আতঙ্ক! সকলেই নানা রকম কথা বলে চ্যাঁচামেচি করছে।

একটা বুড়ী ভিড়ের ভিতর হুমকি খেয়ে পড়ে অদৃশ্য মানুষকে দেখবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ সে ভীত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি ওকে দেখতে পেয়েছি, আমি ওকে দেখতে পেয়েছি!'

বুড়ীর কথা শুনে পূর্ণবাবুও সচকিত দৃষ্টিতে দেখলেন, পথের ধুলার উপরে কাঁচের মতন স্বচ্ছ একখানা মানুষের হাত ক্রমেই বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেখতে দেখতে তার স্বচ্ছতা দূর হয়ে গেল, তখন তাকে দেখাতে লাগল ঠিক যেন ঘষা কাঁচের একখানা হাতের মত।

একটা সেপাই বলে উঠল, 'আরে, আরে, ওর পা-ছুটোও যে দেখা যাচ্ছে !'

দেখতে দেখতে সকলের স্তম্ভিত চোখের সামনে অদৃশ্য মানুষের সমস্ত দেহটাই মায়াময় ছায়ার মত ফুটে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে সেই ছায়াটা ক্রমেই ঘন ও নিরেট হয়ে উঠল ! তারপর অদৃশ্য মানুষ যখন স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হল, তখন সে রক্তমাংসের সম্পূর্ণ গঠন ফিরে পেয়েছে।

যে ঔষধির প্রক্রিয়ায় তার জীবন্ত দেহ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, মৃত্যু সেই ঔষধির গুণ নষ্ট করে তার রক্তমাংসে গড়া দেহকে পৃথিবীর ধূলায় আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

পথের উপরে শুয়ে আছে একটি তিরিশ বছর বয়সের যুবা পুরুষ. তার সারা দেহে আঘাতের চিহ্ন এবং তার মুখে নিরাশা ও ক্রোধের রেখা !

পূর্ণবাবু ছুই হাতে মুখ ঢাকা দিয়ে বলে উঠলেন, 'ওর মুখে কাপড় ঢাকা দাও…দোহাই তোমাদের ! ওর মুখে কাপড় ঢাকা দাও !'

পৃথিবীতে প্রথম যে মানুষটি অপূর্ব বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রসাদে রক্ত-মাংসে গড়া নিরেট দেহকে অদৃশ্য করবার অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করেছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ এমনি শোচনীয়ভাবে সে তার ভারবহ ভীষণ জীবন সমাপ্ত করল !



উপসংহার ॥ ষোল

বাবু বংশীবদন বসুকে তোমরা নিশ্চয়ই কেউ ভোল নি। তোমাদের কারুর যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করার সাধ হয়, তাহলে চুপিচুপি পা টিপে-টিপে আমার সঙ্গে এসো। গোলমাল করলে তাঁর দেখা পাবে না, কারণ তোমরা যে তাঁকে আগে থাকতে চেনো এ-কথা টের পেলেই তিনি তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে পারেন।

শ্রীপুরের পান্থনিবাস হোটেলে আমার সঙ্গে এসো। ঐ দেখো, হোটেলের হলঘরের মাঝখানে একখানা ইজি-চেয়ারের উপরে পরম আয়াসে বসে বসে বংশীবাবু কেমন মিষ্টি-মিষ্টি হাসি হাসছেন।'

বংশীবাবু এখন দাতব্য-জুতো ও ময়লা জামা-কাপড়কে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। তাঁর মাথায় এখন চমৎকার টেরি-কাটা, গায়ে ইস্ত্রি-করা সিল্কের পাঞ্জাবী, পরনে কোঁচানো শান্তিপুরি ধুতি ও পায়ে বার্ণিশ-করা চকচকে জুতো! আর, তোমরা শুনলে বোধহয় অবাক হয়ে যাবে যে, এত বড় পান্থনিবাস হোটেলটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন এখন কেবলমাত্র তিনিই। পান্থনিবাসের এখন এমন পসার যে, শ্রীপুরের কোন লোক 'স্বাস্থ্যনিবাসে'র নাম আর মুখেও আনে না।

এজন্য বংশীবাবু বড়ই খুশী। যখন-তখন একগাল হেসে মাথা নেড়ে বলেন, 'হুঁ-হুঁ বাবা, ঘুঘু দেখেছো, তার ফাঁদ তো দেখো নি! আমার ময়লা জামা-কাপড় আর ছেঁড়া জুতো দেখে মিস্টার দাস ভারী তাচ্ছিল্য করেছিলেন সেদিন। এখন বোধহয় তিনি বংশীবদনের মহিমা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছেন।'

তাঁর হোটেলে বসে কেউ অদৃশ্য মানুষের নিন্দা করলে তিনি মুখ-ভার করে বলেন, 'ওগো, তোমরা সবাই থামো! আমি গুরুনিন্দা শুনব না। তোমরা যাঁকে অদৃশ্য মানুষ বলছ, তিনি ছিলেন আমার গুরুদেব! তাঁর আশীর্বাদেই আজ আমার এত বাড়-বাড়ন্ত!'

বংশীবাবুর গুরুভক্তি দেখে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই! অদৃশ্য মানুষের হুকুমে শ্রীপুর ব্যাঙ্ক থেকে নোট-প্রজাপতিগুলো ফর্‌ফর্‌ করে উড়ে গিয়ে বংশীবাবুর পকেটে যে বাসা বেঁধেছিল, এ-কথা কেউ না জানুক, তোমরা সকলে নিশ্চয় জানো। অতএব এসো, আমরাও সবাই মিলে বংশীবাবুর গুরুজীর জয় দিয়ে পালা সাঙ্গ করি।

●